বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষানীতির রূপরেখা

(বাংলা-bengali-البنغالية)

আবদুস শহীদ নাসিম
সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

1430هـ - 2009م
islamhouse.com

﴿ مخطة مشروع التعليم والتربية الإسلامية في بنغلاديش ﴾

(باللغة البنغالية)

عبد الشهيد نسيم

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2009 - 1430

islamhouse.com

বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষানীতির রূপরেখা

গ্রন্থকারের কথা

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষানীতি আদর্শিক দিক দিয়ে দুই ধারায় বিভক্ত। একটি ধারার আদর্শিক ভিত্তি হলো সেক্যুলারিজম, জাতীয়তাবাদ ও বস্তুবাদী প্রগতিবাদ। এ ধারায় সেক্যুলার টাইপের ধর্ম শিক্ষাকে লেজুড় হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। অপরটি হলো ধর্মীয় ধারা।

প্রথম ধারার শিক্ষা আমাদের ছাত্র ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া ও মেরুদণ্ডহীন করে ছাড়ছে। আর দ্বিতীয় তথা দীনি ধারার শিক্ষা একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শিক্ষা নয়, তেমনি আধুনিক বিশ্ব পরিচালনার উপযুক্ত ও দক্ষ লোক তৈরি করতে ব্যর্থ। তাই বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষানীতি, যা একদিকে হবে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দানকারী, গবেষক ও মুজতাহিদ উৎপাদনকারী এবং ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধের ভিত্তিতে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্র নির্মাণকারী। অপরদিকে এ শিক্ষানীতি হবে যুগ চাহিদার ভিত্তিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি সরবরাহকারী।

বাংলাদেশের এমন একটি শিক্ষানীতি এখনো গুণীজনের স্বপ্নই থেকে গেলো। এ পুস্তিকায় সেই স্বপ্নের শিক্ষানীতিরই একটি প্রস্তাব ও রূপরেখা পেশ করা হলো। যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্যেই এর স্বার্থপরতা।

আবদুস শহীদ নাসিম

অনুবন্ধ

....

অনেক প্রতিভা দিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রতিভাকে যতো বেশি কাজে লাগানো যায়, ততোই তা বিকশিত হয়। মানুষ তার প্রতিভাকে বিকশিত করে দুনিয়া পরিচালনা করে। মানব জীবনের যতোটি বিভাগ আছে তার সর্বক্ষেত্রই মানুষ নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে তার মধ্যে আবার দুটি প্রবৃত্তি ও প্রবণতা দিয়া দেয়া হয়েছে। একটি ভালো আরেকটি মন্দ। আর সে তার প্রবৃত্তি ও প্রবণতা অনুযায়ীই তার প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে থাকে। প্রবণতা যেটা তার মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেয়, তার যোগ্যতাও সেদিকই বিস্তার লাভ করে।

এমতাবস্থায় তার মন্দ প্রবণতাকে বিজিত এবং ভালো প্রবণতাকে বিজয়ী করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে জমিন ও জমিনের অধিবাসীরা বিপর্যয়ের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারেনা। আর এ জন্যই প্রতিটি দেশে এমন একটি সুপরিকল্পিত আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যা তার সর্বপর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে সৎ প্রবণতা অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও মন মানসিকতার দিক থেকে একটি মজবুত অট্টালিকায় পরিণত করবে। বস্তুত একটি আদর্শ জাতির সর্বপ্রকার শিক্ষার লক্ষ্য হবে একটি। যে কোন বিভাগের শিক্ষা তার শিক্ষার্থীকে একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ও ধাবিত করবে। ব্যাপক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করেও যেন তাদের সকলের মন হয় এক, চিন্তা হয় অভিন্ন। একই জনবসতিতে যে লোকগুলো বাস করে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মন মানসিকতা ও চিন্তা চেতনা যদি এক না হয়, তবে তারা এক জাতীয় হতে পারে না। শিক্ষা থেকেই সৃষ্টি হয় নেতৃত্বের। শিক্ষা যদি হয় লক্ষ্যহীন, তবে সে জাতির নেতৃত্বও লক্ষ্যহীনই হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে জাতির উপর নেমে আসে বিরামহীন বিপর্যয়।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। মুসলিম আমলের পর বৃটিশ শাসনামলে সাম্রাজ্যবাদীরা এ দেশের নাগরিকদের লক্ষ্যহীন করে দেয়ার জন্যে চাপিয়ে দেয় লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদীরা বিদায় নিলেও তাদের চক্রান্ত অনুযায়ী লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠে এ দেশীয় লক্ষ্যহীন ব্যক্তিত্ব। বার বার ভূখণ্ডের স্বাধীনতা লাভ করলেও আমরা আজ পর্যন্ত একটি একমুখী আদর্শবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার সাক্ষাত লাভ করতে পারিনি। যার ফলে জাতীয় পর্যায়ে চরম অস্থিরতা জাতিকে অবিরাম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

লক্ষ্যহীন এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আকীদা-বিশ্বাস, মন মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্নমুখী স্রোতে প্রবাহিত করে। এ শিক্ষা উদার নয়, সংকীর্ণ। এ শিক্ষায় ব্যক্তিগত চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ও সর্ব মানবিক চিন্তা করার অবকাশ খুবই কম। এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা মানসিকতার ভিত নেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রত্যয়হীন করে দিচ্ছে। মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছার ধ্যান ধারণা তাদের মধ্যে বাকি রাখছে না। তাদের অসৎ প্রবণতাকে দমন ও সৎ প্রবণতাকে বিজয়ী ও বিকশিত করে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এতে নেই।

এ শিক্ষা ব্যবস্থা এতই মারাত্মক যে, তা একই আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী জনগোষ্ঠীর সন্তানদের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দেয়। আকীদা-বিশ্বাসের এ বিভিন্নতার কারণে বিদ্যাপীঠগুলোতে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রায়ই সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমাদের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আদর্শিক দ্বন্দ্ব এতই প্রকট যে, এ জন্যে অহরহ সঙ্ঘর্ষ লেগে আছে। কারো কারো মতে শিক্ষার প্রস্তুতির চাইতে সঙ্ঘর্ষের প্রস্তুতিতেই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ সময় কাটে। ফলে সেশনজট লেগেই আছে।

বলাবাহুল্য এ ছাত্ররাই আবার শিক্ষক হয়। তাই, আমাদের ছাত্র শিক্ষক সকলের জীবনই লক্ষ্যহীন, লক্ষ পথের অনুসারী। মোট কথা দেউলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আজ এমন চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে যে, চিন্তাশীলরা জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে আতংকিত।

এ শিক্ষাই উৎপাদন করে আমাদের দেশের কর্ণধারদের। এ দুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় তথা সর্বক্ষেত্রের নেতৃত্বের কাঠামোকে ভুল পথে প্রবাহিত করছে। জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে শুধুমাত্র লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে। জাতি আজ সর্বক্ষেত্রে বিক্ষুদ্ধ সংকটকাল অতিক্রম করছে। জাতিকে এখন বাঁচানো প্রয়োজন। তাকে এখন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।

তাই প্রয়োজন একটি পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার, একটি আদর্শিক শিক্ষা ব্যবস্থার। যে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ইসলামি আদর্শের অনাবিল সংস্কৃতির বাহক। যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের অন্তর্গত আকীদা-বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের মন মানসিকতাকে এক করে তুলবে। তাদের চিন্তা চেতনার গতিকে প্রবাহিত করবে অভিন্ন স্রোতে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের অসৎপ্রবণতাকে দমন করবে, করবে নিরুৎসাহিত। তাদের মনকে করবে উদার। যে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে তাদের জীবনবোধ উৎসারিত সংস্কৃতির বাহন এবং তাদেরকে তাদের জীবন লক্ষ্যে পৌঁছাবার সিঁড়ি। জীবনের যে ক্ষেত্রেই তারা কর্মরত থাকুক না কেন তাদের জীবন লক্ষ্যকে করবে এক। তাদের পরিণত করবে একই চিন্তার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতিতে।

বলাবাহুল্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামে পরিণত হবার পূর্বে এ দেশবাসীর হাতে এমনি একটি শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিলো। সে শিক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্ট নেতৃত্ব গোটা ভারত বর্ষকে সুনিপণভাবে শাসন করেছে। আর তা হচ্ছে ইসলাম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থাই নাগরিকদের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন। কিন্তু এ আপত্তিও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি।

তাই আমাদের জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে একটি আদর্শ মানব সমাজে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন অবিলম্বে এখানে ইসলামের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পিত আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।[১]

১. যুগপূর্তি স্মরণিকা আল আমীন একাডেমী, চাঁদপুর, মার্চ ১৯৯০ ইং।

শিক্ষা কি ? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ?

দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে গেছেন। প্রাচীন দার্শনিক এরিস্টোটল, সক্রেটিস ও প্লেপটো শিক্ষার তাৎপর্য বর্ণনা করে গেছেন। সেই থেকে পরবর্তী সকল যুগের চিন্তাবিদরাই শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলেছেন। শিক্ষার পরিচয় এবং সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন।

আল কুরআন থেকে জানা যায়, নবীগণ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ জাতির সামনে পেশ করেছেন। সর্বেশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ আল কুরআন এবং তাঁর নিজের বাণী হাদীস থেকে শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়।

১ শিক্ষা কি ?

এবার আমরা জানতে চেষ্টা করবো শিক্ষা কি? শিক্ষার সংজ্ঞা কি? তাৎপর্য কি? আর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বলতে কি বুঝায়? প্রথমে কয়েকটি শব্দ ব্যাখ্যা করতে চাই। যেসব শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষা বুঝানো হয় সেগুলোর বিশ্লেষণ শিক্ষার মর্ম বুঝার সহায়ক হবে। যেমন কোনো বস্তুকে বুঝতে হলে তার উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা একান্ত জরুরি।

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রতিশব্দ হলো Education. Education শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলো : শিক্ষাদান ও প্রতিপালন, শিক্ষাদান, শিক্ষা। Educate মানে : to bring up and instruct, to teach, to train অর্থাৎ প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করানো। ২

Joseph T. Shipley তাঁর Dictionary of word Origins এ লিখেছেন, Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Edex এবং Ducer-Duc শব্দগুলো থেকে। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো, যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। আরেকটু ব্যাপক অর্থে তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে দেয়া।

একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, Education শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভবনার পথ নির্দেশক।৩

আরেকজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন :

Education denotes the realization of innate human potentialities of individuals through the accumulation of knowledge.4

কুরআন হাদীস এবং আরবী ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দগুলো এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এ ক্ষেত্রে পাঁচটি শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। সেগুলো হলো : ১. তারবীয়াহ (تربية) ২. তালীম (تعليم) ৩. তাদীব (تأديب) ৪. তাদরীব (تدريب) ৫. তাদরীস (تدريس) ।

এই শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ :

تربية শব্দটি নির্গত হয়েছে ربو শব্দ থেকে। ربو মানে : Increase, to grow. to grow up, to exceed, to raise, rear, bring up, to educate, to teach, instruct, to bread, to develop, augment.

আর تربية মানে : Education, up bringing Instruction, Pedagogy, Breeding, Raising. 5

2. Samsad English-Bengali Dictionary, Calutta 22nd pression, September 1990.

৩. মোহাম্মাদ আজহার আলী : পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন, বাংলা একাডেমী-১৯৯৮।

৪. Education in Islamic Society : A. M. Chowdhury : Dhaka 1965

৫. মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়াতিল মুআসিরাহ By J. Milton Cowan.

تعليم শব্দটি গঠিত হয়েছে علم থেকে। তালীম (تعليم) মানে : Information, Advice, Instruction, Direction, Teaching, Training, Schooling, Education, Apprenticeship.৬

تأديب [তাদীব] শব্দটি গঠিত হয়েছে أدب [আদব] শব্দ থেকে। আদব (أدب) মানে : Culture, Refinement, Good breeding, Good, manners, Social graces, Decorum. এ অর্থবহ أدب [আদব] শব্দটি থেকেই গঠিত হয়েছে تأديب শব্দ। তাই তাদীব শব্দের মধ্যে একদিকে যেমন এই সব অর্থও নিহিত রয়েছে, অন্যদিকে তাদীব দ্বারা Education এবং Discipline ও বুঝায়।৭

تدريب [তাদরীব] মানে : Habitation, Accustoming, Practice, Drill, Schooling, Training, Coaching, Tutoring.8

تدريس [তাদরীস] শব্দটি গঠিত হয়েছে درس [দারস্] শব্দ থেকে। তাদরীস মানে : To study, to learn, to teach, to instruct, to wipe out, to blot out, to thrash out, tution.9

আভিধানিক অর্থ থেকেই পরিষ্কার হলো, এই পরিভাষাগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দদ্বয় অত্যন্ত প্রশস্ত ভাব বাঞ্চনাময়। তৃতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিশেষভাবে আচরণগত সুশিক্ষাদান অর্থে। চতুর্থ শব্দটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাংখিত অভ্যাস গড়ে তোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম শব্দটি ব্যবহৃত হয় পঠন, পাঠন, শিক্ষাদান, পাঠদান এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে অনাকাংখিত অভ্যাস ও অবস্থা দূরীকরণ অর্থে।

এই পরিভাষাগুলো থেকে শিক্ষার সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য ও ব্যাপক পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এই পাঁচটি পরিভাষার মর্মার্থ সাজিয়ে লিখলে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। আভিধানিক অর্থ থেকে এই পরিভাষাগুলোর মর্ম দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

---

১. প্রবৃদ্ধি দান করা/বৃদ্ধি করা/বড় করে তোলা।
২. উন্নত করা/উঁচু করা/ অগ্রসর করানো।
৩. পূর্ণতা দান করা/মহত্তর/ মহান করা/প্রস্ফুটিত করা।
৪. জাগিয়ে তোলা/উত্থিত করা/ উজ্জীবিত করা।
৫. নির্মাণ করা/প্রতিষ্ঠিত করা/গড়ে তোলা।
৬. লালন পালন করা/ প্রতিপালন করা।
৭. শিক্ষাদান করা/শিক্ষিত করে তোলা।
৮. অভ্যাস করানো/ অনুশীলন করানো/ হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া/চর্চা করানো/নিয়মানুবর্তিতা শেখানো।
৯. পরামর্শ দেয়া/শিক্ষাপূর্ণ আদেশ দেয়া/জ্ঞাপক করা/উপদেশ দেয়া।
১০. অনাকাংখিত আচরণাদি থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে শাসন করা/সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্যে শাসন করা।
১১. অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করা/সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা/জন্মগত শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে প্রস্ফুটিত ও উদ্দীপ্ত করে দেয়া।
১২. সম্প্রসারিত করা/একটু একটু করে খোলা/বিকশিত করা।
১৩. পথ প্রদর্শন করা/পথ নির্দেশনা দান করা/সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।
১৪. প্রেরণা দেয়া/উদ্বুদ্ধ করা/উদ্দীপ্ত করা/উৎসাহ প্রদান করা।
১৫. সন্ধান দেয়া/সংবাদ দেয়া/তথ্য প্রদান করা।
১৬. শিক্ষাদান পূর্বক নিয়মানুগ করানো।
১৭. আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান।
১৮. শিক্ষা নবিশিতে ভর্তি হওয়া।
১৯. সংস্কার করা/সংস্কৃতবান করা/সুসভ্য করা/সংশোধন করা/ঘসে মেজে পরিচ্ছন্ন করা/নির্মল করা।
২০. শালীনতা, ভদ্রতা, শোভনতা, শিষ্টাচার এবং সম্মানজনক ও মর্যাদা ব্যঞ্জক আচার ব্যবহার শেখানো।
২১. ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও অমায়িক আচরণ শেখানো।
২২. আদব কায়দা শিক্ষাদান/উন্নত জীবন প্রণালী শেখানো।
২৩. উন্নত নৈতিক আচরণ শিক্ষাদান/সচ্চরিত্র শিক্ষাদান।
২৪. প্রথা ও রীতিনীতি অভ্যস্ত করানো।
২৫. মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক ধাত পরিগঠন করা।
২৬. কর্মদক্ষ করানো/কর্মে অভ্যস্ত/ কৌশল শেখানো/ নিপুণতা অর্জন করা।
২৭. অধ্যয়ন করা/দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশের সাথে পাঠ করা/স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে অধ্যয়ন করা।
২৮. বিচার বিবেচনা করা/চিন্তাভাবনা করা/গবেষণা করা/পুংখানুপুংখ পরিক্ষা করা/অনুসন্ধান করা।
২৯. উদ্ভাবন করা।
৩০. বিদ্যার্জন করা/পাণ্ডিত্য অর্জন করা/শেখা/জানা/দক্ষতা অর্জন করা।

....

আরবি ও ইসলামি পরিভাষায় শিক্ষার জন্যে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, এ হলো সেগুলোর বাংলা অর্থ ও মর্ম। এর মধ্যে একেবারে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ বিকাশ উন্নয়ন, পরিশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও মনীষীদের মতামত আলোচনা করলেও দেখা যায়, তাঁদের কেউ কেউ শিক্ষার খুব সংকীর্ণ অর্থ করেছেন।

আবার কারো কারো দৃষ্টিতে শিক্ষার পরিচয় পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মূলত শিক্ষা মানুষের পুরো জীবন পরিব্যাপ্ত। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপকতা পরিব্যাপ্ত। মানুষ তার পূর্ণাঙ্গ জীবনে যা কিছুই আহরণ করে, আত্মস্থ করে, তা শিক্ষার মাধ্যমেই করে। যে কোনো জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই হলো শিক্ষা।

২ শিক্ষার উদ্দেশ্য :

প্রথমেই দেখা যাক, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনীষীরা কে কি বলেছেন :

জন ডিউই বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি।

প্লেটোর মত হলো : শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তর্ভূক্ত।

প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিসের মতে : শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার। **এরিস্টোটল বলেছেন :** শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যে হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা।

শিক্ষাবিদ জন লকের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্বকরণ। **বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন :** শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ।

কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল এর মতে : শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি।

কমেনিয়াসের মতে : শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর মানুষের শেষ লক্ষ্য হবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা।

পার্কার বলেছেন : পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্ম প্রকাশের জন্যে যেসব গুণাবলী নিয়ে শিক্ষার্থী এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব গুনাবলীর যথাযথ বিকাশ সাধন।

জীন জ্যাক রুশোর মতে : সুঅভ্যাস গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

Bartrand Russell এর মন্তব্য হলো :.......The education system we must aim at producing in the future is one which gives every boy and girl an opportunity for the best that exists.

স্যার পার্সীনান বলেছেন : শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো : চরিত্র গঠন, পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং ভালো দেহ ভালো মন গড়ে তোলা।

ডা: হাসান জামান বলেছেন :প্রত্যয় দীপ্ত মহৎ জীবন সাধনায় সঞ্জিবনী শক্তি সঞ্চার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। **ড: খুরশীদ আহমেদের মতে :** স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি করা.........এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতিক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আল্লামা ইকবালের মতে : পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

বিখ্যাত দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তানায়ক সাইয়েদ মওদূদী (রা) বলেন :

মানুষ কেবল চোখ দিয়েই দেখে না, এর পেছনে রয়েছে তার সক্রিয় মন ও মগজ। রয়েছে তার একটা দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত। জীবনের একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে তার। সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটা প্রক্রিয়া তার আছে। মানুষ যা কিছু দেখে, শুনে এবং জানে, সেটাকে সে নিজের আভ্যন্তরীণ মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে নেয়। অত:পর সেই চিন্তা ও ধ্যান ধারণার ভিত্তিতেই তার জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠে। এই জীবন পদ্ধতিই হলো সংস্কৃতি। যে জাতি একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অধিকারী এবং যাদের রয়েছে নিজস্ব জীবনাদর্শ, তাদেরকে অবশ্যই তাদের নতুন প্রজন্মকে সেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ

এবং তার বিকাশ ও উন্নয়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য। আর সে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা।১০

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতভাবে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। এতে চুয়ান্নটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৮ শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করার দলিল। অনুচ্ছেদ ২৯/১-এ শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ :

শিক্ষার লক্ষ্য
অনুচ্ছদ : ২৯

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের দিক্ষা দানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে-
ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ;
খ. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ :
গ. শিশুর পিতা-মাতা তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ :
ঘ. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি :
ঙ. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।
এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণের করলে দেখা যায়, জাতি সংঘ সাধারণ পরিষদের দৃষ্টিতে শিশুর লক্ষ্য হলো :

১. ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ:
২. মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ;
৩. মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ;
৪. শারীরিক সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ;
৫. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
৬. মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
৭. জাতিসংঘ ঘোষণার বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
৮. পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
৯. নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১০. নিজস্ব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১১. নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১২. মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১৩. অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;
১৪. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ. নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ;
১৫. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

মহানবীর শিক্ষানীতি

আদর্শ জাতি গঠনের জন্যে প্রয়োজন আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে একটি বিশ্বজনীন জাতি গঠনের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। ইসলাম আল্লাহর মানোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ। এ আদর্শের ভিত্তিতে মানবজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আদর্শের ভিত্তিতে একটি বিরাট মানবগোষ্ঠী গঠন করে তাকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

শুধুমাত্র মানুষকে ইসলামের আদর্শ শিক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি প্রথমে মানসিক বিপ্লব ঘটান। তারই ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। ইসলামি বিপ্লব ছাড়া বিনা প্রয়োগে শুধু শিক্ষা দানের মাধ্যমে পৃথিবীতে আর কোনো বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। তাঁর এই শিক্ষাভিত্তিক বিপ্লব পৃথিবীতে এক অনন্য ইতিহাস। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও মূর্খতার চরম অন্ধকারে নিপতিত একটি অধপতিত জাতিকে শুধুমাত্র আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে তিনি রূপান্তরিত করেন। গঠন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব দল। এ ছিলো একটি অনন্য আদর্শের অধিকারী মানব দল। কোনো দিক থেকেই তাঁদের সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীর তুলনা হয়না। এখানে আমরা আলোচনা করে দেখবো, কোন্ ধরণের শিক্ষার মাধ্যমে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ওয়াসাল্লাম এই অন্যন্য শ্রেষ্ঠ মানব দলটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

রসূলের শিক্ষানীতি কতিপয় দিকঃ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহর নবী। সর্বশেষ নবী। নবূয়্যতি সর্বশেষ আদর্শ। তাঁর পরে এ বিশ্বে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবেনা। তাই তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবূয়্যতি শিক্ষা মিশনের পূর্ণতা দান করেন। এ কারণে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা কাঠামো ছিলো সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ। ষোলকলায় সমৃদ্ধ, সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও পরিপাটি। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মিত হয়েছিল মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। তাঁর শিক্ষানীতি কোনো বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর জন্যে নয়, বরং বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে রচিত হয়েছে। তাই তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষানীতি সার্বজনীন ও চিরন্তন। কিয়ামত পর্যন্ত এই চিরন্তন শিক্ষানীতির বিকল্প কোনো শিক্ষানীতি মানবতার জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণবহ হবে না। তাঁর দেয়া শিক্ষাই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শাশ্বত ও সার্বজনীন শিক্ষাদর্শ। তাঁর শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্টগুলো নিন্মরূপঃ

১. জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ তাআলাঃ

রসূলের শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হলো, জ্ঞানের প্রকৃত উৎস আল্লাহ তাআলা। মানুষ ও নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস ও প্রকৃত মালিকঃ

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عَنْدَ اللهِ ـ (الملك : 26 الاحقاف : 23)

হে নবী বলুন ! আল্লাহই সমস্ত জ্ঞানের মালিক (সূরা মূলক : ২৬, আহকাফ : ২৩)

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (النساء: 26)
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময় [সূরা নিসা : ২৬]

গোপন-প্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য, মূর্ত-বিমূর্ত সব কিছুর জ্ঞান তাঁর কাছে রয়েছে এবং একমাত্র তাঁরই কাছে আছে:
هُوْ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - (الحشر :22)

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। [সূরা হাশর : ২]

মানুষ এতোই সীমিত জ্ঞানের অধিকারী যে, তাঁর অসীম জ্ঞান সীমার নাগালের ধারে কাছেও পৌঁছুতে সক্ষম নয়। তবে যিনি ইচ্ছে করে মানুষকে যতোটুকু জ্ঞান দান করতে চান, সে কেবল ততোটুকুই জানে :

وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَئٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ - (البقرة:255)

তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কোনো কিছুই মানুষ নিজের আয়ত্বাধীন করতে পারেনা, তবে তিনি যতটুকু চান। [সূরা বাকারা: ২৫৫]
মানুষকে তিনিই জ্ঞান দান করেন। তবে মানুষকে তিনি সামান্য জ্ঞানই দান করেছেন :
وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً - (الاسراء :85)
তোমাদের জ্ঞানের কোনো অংশ দেয়া হয়নি, তবে সামান্য মাত্র। [সূরা বনি ইসরাইল : ৮৫]

তাই, মানুষের কর্তব্য তাঁর কাছেই জ্ঞানের জন্যে আরাধনা করা:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا - (طه : 114)

বলোঃ প্রভু! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দাও। [সূরা তোয়াহা : ১১৪]

২. জ্ঞানের মূলসূত্র অহী ও নবুওয়ত :

জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই প্রকৃত জ্ঞান লাভ ছাড়া মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জ্ঞান লাভের সূত্র হলো অহী ও নবুওয়ত। আল্লাহ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে তাদের মধ্যে থেকেই কিছু কিছু ব্যক্তিকে নবী-রসূল নিযুক্ত করেছেন। তাদের কাছে তিনি প্রকৃত জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যমে তিনি মানবতার মুক্তির জন্য পূর্ণ জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। যে পদ্ধতিতে নবীর কাছে জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয়, তার পারিভাষিক নাম অহী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হবার কারণে তাঁর মাধ্যমে অবতীর্ণ শিক্ষা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ শিক্ষা আমাদের কাছে দুইভাবে সংরক্ষিত আছে। এক, কুরআনের মাধ্যমে। দুই, হাদীস বা সুন্নাতে রসূলের মাধ্যমে। কুরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল গ্রন্থ। একেকটি শব্দসহ গোটা গ্রন্থটি সন্দেহ সংশয়ের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে। এই প্রতিটি বাক্য ও শব্দ হুবহু [as it is] আল্লাহর নকিট থেকে অবতীর্ণ। এ হচ্ছে জ্ঞানের সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অনাবিল সূত্র। হাদীস মূলত কুরআনেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। কুরআনকে নবুওয়তি পন্থা ও

দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হাদীসের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। তাই ইহজগত ও পরজগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করতে হলে মানুষকে অবশ্যি জ্ঞানের এই মূল সূত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এছাড়া বিকল্প নেই।

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ (الانعام : 19)

এই কুরআন আমার কাছে অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি এর সাহায্যে তোমাদের সতর্ক করতে পারি। [সূরা আনআম : ১৯]

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿6﴾ (النمل : 6)

নি:সন্দেহে তুমি এই কুরআন এক মহাবিজ্ঞানী সত্তার নিকট থেকে লাভ করছো। [সূরা নামল : ৬]

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ(النساء:113)

আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন আর তোমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিলো না। [সূরা আন নিসা: ১৩৩]

اِنَّ هَذَ الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ : (بنى اسرائيل : 9)

এই কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে, যা সম্পূর্ণ সরল সোজা ও ঋজু। আর যারা একে মেনে নেয়, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে। [সূরা বনি ইসরাঈল : ৯]

شَهَرَ رَمَضَانَ الَّذِىْ اَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًىْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٌ مِنْ الْهُدَىْ ـ (البقرة : 185)

রমযান মাস! এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এতে গোটা মানব জাতির জন্য রয়েছে। জীবন যাপনের জন্য বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট শিক্ষায় পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে। [সূরা আল বাকারা : ১৮৫]

৩. আসল শিক্ষক নবী নিজে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, তার মূল শিক্ষক তিনি নিজেই। কী শিক্ষা দিতে হবে? এসব ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আদর্শ। তাকেঁই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার সকল দিক ও বিভাগে অনুসরণ করতে হবে তাঁরই পদাংক:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلَ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللهَ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ ـ (الاحزاب : 21)

তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা। ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আশাবাদী। [সূরা আহযাব : ২১]

তিনি শুধু নমুনাই নন। বরং মুমিনদের পক্ষে তাঁর নমুনা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জীবনের সবকিছু গ্রহণ বর্জন করতে হবে কেবল তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿7﴾ (الحشر : 7)

রসূল তোমাদের যা দেয় তাই গ্রহণ করো যা বর্জন করতে বলে, তা থেকে বিরত থাকো। [সূরা হাশর : ৭]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ ـ (ال عمران:31)

হে নবী! তাদের বলো : তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করো, তবে আমাকে অনুসরণ করো।আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। [সূরা আলে ইমরান : ৩১]

৪. আল্লাহর দাসত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব নীতির শিক্ষা ব্যবস্থা :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা যে মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাহলো মানুষ বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও পরিচালক এক লা-শরিক আল্লাহর দাস। তাঁর দাসত্ব করার জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাঁর দাস মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿56﴾ (الذاريات:56)

আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু মাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য। [সূরা যারিয়াত : ৫৬] এই দাস মানুষকে পৃথিবীতে যে তাঁর প্রতিনিধিও নিযুক্ত করবেন, একথা মানুষকে সৃষ্টি করবার প্রাক্কালেই তিনি ফেরেশতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন :

وَاِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِىْ الاَرْضِ خَلَيْفَةً ـ (البقرة : 30)

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশাতাদের বললেন নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করছি। (সূরা বাকারা:৩০)

মানুষের মধ্যে আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার চেতনা জাগ্রত করে দিয়ে তাকে আল্লাহর সত্যিকার দাস ও প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলাই এ শিক্ষানীতর মূল কথা। আর এটাই মানুষের প্রকৃত ও সত্যিকারের মর্যাদা। তাই নবুওয়তি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আদর্শ নাগরিক তৈরি নয়, আদর্শ মানুষ তৈরি।

এই শিক্ষনীতি মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা দিয়েছে, তাহলো, মানুষ এক লা-শরিক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের [দীন ও শরিয়ার[ভিত্তিতে তাঁর দাসত্ব করবে। সে শুধু নিজের একার মুক্তির জন্যেই কাজ করবেনা, বরঞ্চ আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গোটা বিশ্ব মানবতার পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ, মুক্তি ও উন্নয়নের জন্যে নি:স্বার্থ ভাবে কাজ করে যাবে। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে আখিরাতের আদালতে তাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে এবং পরিণতিতে চিরকাল যন্ত্রাণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে যে এ সব দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে তার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। এভাবেই মানুষ সত্যিকারভাবে ইবাদত ও খিলাফতের সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আর্দশ মানুষে পরিণত হবে। আর এ উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে :

ـمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿207﴾ (البقرة:207)

আরেকটি মানব দল আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজেদের জান প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়। মূলত : আল্লাহ তাঁর এই দাসদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। [সূরা আল বাকারা : ২০৭]

মানুষকে এভাবে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। কারণ এটাই মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ।

৫. পূর্ণাঙ্গ জীবন ভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষা

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর শিক্ষা মানব জীবনের কোনো একটি বা দুটি দিকের জন্য সীমাবদ্ধ শিক্ষা নয়। বরঞ্চ তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার কেবল বৈষয়িক ও বস্তুগত শিক্ষার প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়। এই একমুখী বস্তুগত শিক্ষাই বর্তমান বিশ্বের সমস্ত বিপর্যয়ের মূল কারণ। আসলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ভিত্তিক শিক্ষাই কেবল মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। ইসলাম মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করতে চায়। তাই ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথিদের একই সাথে আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, শরীরিক, জৈবিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেননি। বরং একটি এককের অধীন করেছেন। মূলত জীবনের সকল দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের ষোল আনাকে বিকশিত করতে পারলেই মানুষ আদর্শ মানুষ পরিণত হতে পারে :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿177﴾ (البقرة: 177)

পূর্ব কিংবা পশ্চিম দকে মুখ ফিরানো আসল পূণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত পূণ্যের কাজ তো সেই ব্যক্তি করলো, যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলো আল্লাহ, পরকালে, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি আর আল্লাহর ভালবাসা পাবার জন্যে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করলো আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে। তাছাড়া সালাত কায়েম করলো এবং যাকাত পরিশোধ করলো আর এই পূণ্যবান লোকেরা হয়ে থাকে প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং দারিদ্র, দু:সময়, দু:খ-দুর্দশা, বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণকারী। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী। [সূরা আল বাকারা : ১৭৭]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রকম সত্যপন্থী ন্যায়বান আর্দশ মানুষই তৈরি করেছিলেন। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী বিকশিত করে দিয়েছিলেন তিনি তার সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ শিক্ষা মানুষকে কেবল বৈষয়িক দিক থেকেই যোগ্য করে না, পরকালীন সাফল্যও প্রদান করে। তাইতো নবীর ছাত্ররা তাদের মনিবের দরবারে উভয় জগতের সাফল্য ও কল্যাণের ফরিয়াদ করে :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِیْ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِیْ الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ (البقرة : 201)

আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো। আর পরকালের কল্যাণও। আর আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (সূরা বাকারা : ২০১)

বস্তুত এই শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গতার কারণেই নবীর সাথীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব দলে পরিণত হয়েছিলেন।

মুসলিম শাসনামলে উপমহাদেশের ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা

১. আভাস

৬২২ ঈসায়ি সালে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হয়। ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা সেখানে থেকেই। মসজিদে নববী ইসলামের প্রথম শিক্ষায়তন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম শিক্ষক। সাহাবায়ে কিরাম প্রথম ছাত্রসমাজ। এখান থেকেই সম্মুখে অগ্রসর হয় উম্মতে মুহাম্মাদীর শিক্ষার ইতিহাস।

অতপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের উত্তরসূরীরা পৃথিবীতে লাঞ্চিত ও বঞ্চিত মানবতার দুয়ারে দুয়ারে বয়ে নিয়ে যান ইসলামের সুমহান শিক্ষা। যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ গড়ার কেন্দ্র। সেখানেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে জ্ঞানের আলো। এক নতুন সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রাণ চাঞ্চল্য।

ইসলামের এ সুমহান সভ্যতা সংস্কৃতির জোয়ারেই প্লাবিত হয়েছিল তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ হিন্দুস্তান। ব্যাপকভাবে এসেছেন এখানে ইসলামের পাতাকাবাহীরা। তাঁরা এসেছেন আরব, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে। তাঁরা এসেছেন কখনো বীরের বেশে, কখনো দরবেশের বেশে। তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে, গ্রামে গঞ্জে বন্দরে। ব্যক্তিগত ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এদেশে গড়ে তুলেছিলেন হাজারো শিক্ষাকেন্দ্র। সেসব শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তৈরি হয়েছেন অসংখ্যা শাসক ও কর্মচারী, সৈনিক ও সেনাপতি, ফকীহ ও আলেমে দীন এবং মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। মোটকথা, একটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার দক্ষ লোকই সে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তৈরি হয়েছিল।

২..উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ও শাসন.

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই এদেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে থাকেন। পরবির্তীকালে হাজারো মুবাল্লিগ এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এমনকি মুসলমান আরব ব্যবসায়ীরাও এদেশে ইসলাম প্রচার করেন। এদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের অসংখ্যা মানুষ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিরাট বিরাট এলাকা ইসলামের ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলামানগণ এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। উমাইয়া খলীফা ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে [৭০৫-৭১৫ খৃ:] সেনাপতি ইমাদ উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন কাসেম সাকাফি সর্বপ্রথম [৭১২-৭১৩ খৃ:] ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান এলাকা মুসলিম শাসনাধীন করেন। অতপর গযনীর সুলতান সবুকতগীন [৯৭৭-৯৯৭ খৃ:] এবং তার পুত্র সুলতান আবুল কাসেম মাহমুদ [৯৯৮-১০৩০ খৃ:] পূর্বদিকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত গযনীর ইসলামি রাজ্যকে বিস্তৃতি করেন। এরপরে বিভিন্ন সময় নানা উপায়ে বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তি ও বংশ এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁরা গোটা ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব বিস্তৃত করতে সক্ষম হন। সর্বশেষ শাসক ছিলেন মুগল বংশের সম্রাটগণ। তাঁদের শাসন যুগের শেষদিকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংরেজরা বাংলাদেশ দখল করে মুগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে তাদের আশ্রয়ে বৃত্তিভোগী শাসকে পরিণত করে। সর্বশেষ ইংরেজ বৃত্তিভোগী মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহের [১৮৩০-১৮৫৭ খৃ:] আমলে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় এবং বিপ্লবীগণ কর্তৃক তাকে ভারত সম্রাট ঘোষণা করায় ইংরেজরা তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে এবং তাঁর সন্তানদের দিল্লীর রাজপথে গুলী করে হত্যা

করে। এদেশে ইংরেজদের হাতে এভাবে মুসলমানদের ক্ষমতা নি:শেষ হয়ে যায়। গোটা মুসলিম ভারত করায়ত্ব করতে তাদের একশত বছর সময় লাগে।

৩. উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

কয়েক শতাব্দীকালের এ দীর্ঘ শাসনামলে এদশে মুসলামানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো দক্ষ ও আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা। মুসলামানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী বিপ্লব সাধন করেন। ১৮৮২ সালে ইংরেজদের এক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয় :

আর সব মুসলিম দেশের মতই ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর তারা তাদের মসজিদগুলোকে শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য সরকারকে তেমন ব্যয়ভার বহন করতে হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াকফ ও উইলের সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দীনদার লোকেরা পারলৌকিক পূণ্য লাভের জন্য ওয়াকফ এবং সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করে যান। পাক ভারতীয় মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্রাসার এ অবস্থা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত বলবত থাকে।

উপমহাদেশে মুসলমানদেরে শিক্ষা কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠার একটা চিত্র এ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এদেশে সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। অবশ্য ইতিহাসের গ্রন্থাবলী থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আবুল কাসেম মাহমুদের শাসনামল থেকে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।

প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মাদ সলীম লিখেছেন :

৫৮৯ হিজরী মোতাবেক ১১৯২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্তানে মুয়েযুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে সাম [শিহাবুদ্দীন গোরী নামে খ্যাত] কর্তৃক ইসলামি হুকুমাত কায়েম হয়। তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে রাজ্যের চতুর্দিকে শিক্ষা দীক্ষার চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। এ জ্ঞানপ্রিয় বাদশাহ সর্ব প্রথম দিল্লীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাদশার নাম অনুযায়ী এ মাদ্রাসার নামকরণ হয়, মাদ্রাসায়ে মুয়েযীয়া। পরবর্তী বাদশাহ কুতুবদ্দীন আইবেক [১২০৬-১২১২ খৃ:] আজমীরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাকে আড়াই দিনের ঝুপড়ি বলা হতো। তৃতীয় মাদ্রাসাটি মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসীরুদ্দীন কুবাচা উচে প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাযি মিহনাজুদ্দীন সিরাজ জুরজানি [মৃত্যু ১২৬০ খৃ:] সর্ব প্রথম উচ্চ মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োজিত হন। পরে তিনি মাদ্রাসা মুয়েযীয়ার প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হন।

অতপর মুসলিম শাসক, আলেম, আমীর ও বিদ্যোৎসাহী দীনদার লোকদের প্রচেষ্টায় গোটা ভারববর্ষের আনাচে কানাচে মকতব মাদ্রাসা তথা ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী।

সুলতান মুহাম্মাদ বিন তুগলকের [১৩৫২-১৩৫৯ খৃ:] আমলে দিল্লীতে এক হাজার মাদ্রাসা ছিলো। এর মধ্যো শাফেয়ি মাযহাবের লোকদের একটা মাদ্রাসা ছিলো। শিক্ষকদের সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা প্রদান করা হতো। মাদ্রাসাগুলোতে দীনি শিক্ষার সাথে সাথে অংক এবং দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষাও দেয়া হতো।

রোহিলা খন্ডের হাফেযুল মুলক নওয়াব রহমত আলী খানের [মৃত্যু ১৭৪৪ খৃ:] জীবন চরিত থেকে জানা যায় :
দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ার পরও কেবলমাত্র রোহিলা খন্ড জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার পাঁচ হাজার আলিম শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। হাফেযুল মুলক নওয়াব রহমত আলী খানের কোষাগার থেকে তারা নিয়মিত ভাতা পেতেন।
এস, বসুর এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থ থেকে জানা যায়:
ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবলমাত্র বাংলাদেশই আশি হাজার মকতব ছিলো। [ম্যাকস মুলারের শিক্ষা রিপোর্ট]

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছিল :

মুসলিম শাসনামলে এদেশে বিভিন্ন সময় নানা প্রকার বিছিন্ন প্রচেষ্টায় মকতব ও মাদ্রাসা গড়ে ওঠে।

১. কখনো ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কল্যাণধর্মী কাজ হিসেবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং খরচ বহনের জন্যে মাদ্রাসার নামে সম্পত্তি ওয়াকফ দিতেন। এ সম্পত্তি থেকেই শিক্ষক ও ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো। ছাত্রদের শিক্ষা ও জীবিকার যাবতীয় ব্যয় মাদ্রাসা থেকেই বহন করা হতো।

২. অনেক সময় কোনো আলিম ব্যক্তগত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন। তিনি নিজেই শিক্ষক নিয়োগ করতেন, ছাত্রদের শিক্ষা ও খাবার ব্যয় নির্বাহ করতেন।

৩. কখনো কোনো ধনী ব্যক্তি নিজ সন্তানদের শিক্ষার জন্যে শিক্ষক নিয়োগ করতেন। ঐ শিক্ষককে কেন্দ্র করে ছাত্র সংখ্যা বাড়াতে মাদ্রাসার আকার ধারণ করতো। শিক্ষক নিয়োগকারী নিজেই যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন।

৪. কখনো আবার যোগ্য আলিমকে কেন্দ্র করে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা তাঁর পাশে জড়ো হতো। লেখাপড়া চলতো মসজিদে। ছাত্ররা লজিং থাকতো এবং শিক্ষকগণ থাকতেন মসজিদের হুজরায়।

৫. কোনো কোনো সময় শাসকগণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং তারাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এমনিভাবে অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় অসংখ্যা মকতব মাদ্রসা গড়ে উঠেছিল। এটা ছিলো শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের নজীরবিহীন আগ্রহের ফল।

৫. মাদ্রসা গৃহ:

মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর কয়েক শতাব্দী যাবত মসজিদই মুসলামানদের শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রথম স্বতন্ত্র গৃহ কখন এবং কোথায় নির্মিত হয়েছিল সে ইতিহাস সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে বের করা মুশিকল। তবে যতোটুকু জানা যায়, এদেশে মুসলামানদের চার প্রকার শিক্ষা কেন্দ্র ছিলো: মসজিদ,মাদ্রসা ও মকতবের স্বতন্ত্র গৃহ, কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির বসতবাটির অংশ বিশেষ এবং কোনো গাছের নিচে।

৬. মাদ্রাসার আসবাবপত্র:

প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মাদ সলীম তাঁর হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুকা নিযামে তালীম ও তারবিয়াত গ্রন্থে মুসলিম শাসনামলে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আসবাবপত্র সম্পর্কে লিখেছেন:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হতো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের। বালকদের বসার জন্যে থাকতো চাটাইয়ের বিছানা; কিতাবপত্র রাখার জন্যে ভূমি থেকে অল্প উঁচু কাষ্ঠখন্ড; শিক্ষকের বসার জন্যে গদীর আসন। এ ছাড়া পাঠ্য পুস্তকাদি এবং সামান্য কাষ্ঠ সামগ্রীর সমন্বয়ে গঠিত হতো গোটা প্রতিষ্ঠান। টেবিল চেয়ার তো সে সময় নবাবদের বাড়ীতেও পাওয়া যেতোনা। ইংরেজদের বিজয়ের পরই এসবের প্রচলন শুরু হয়। অপ্রয়োজনীয় কোনো আসবাবপত্র মাদ্রাসায় থাকতো না। অতিশয় মিতব্যয়ীতা ও সাদাসিধেভাবে কর্ম সম্পাদন করা হতো। এ কারণে মাদ্রসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালানা খুবই সহজ ছিলো।

৭. শিক্ষার কাঠামো

মুসলিম শাসনামলে এদেশে শিক্ষা বিভাগ নামে স্বতন্ত্র বিভাগ ছিলো না। পাঠ্য বিষয় এবং পাঠ্যসূচী প্রণয়নেও সরকারের কোন হাত ছিলো না। উলামায়ে কিরাম এবং শিক্ষকগণই ঠিক করতেন কি পড়াবেন। তাই সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষানীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতো না। তবে শেষ পর্যন্ত নিম্নরূপ একটি বুনয়াদি কাঠামো গড়ে ওঠে।
১. মকতব: এতে কুরআন পাঠ ও ফার্সি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো।
২. ফার্সি মাদ্রাসা: মূলত আরবি মাদ্রসাগুলোই ছিলো উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র। এতে আরবি ভাষা ও দীনি ইলমের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো।

৮. ভর্তি

মকতব এবং ফার্সি মাদ্রাসাসমূহে ভর্তির ব্যাপারে তেমন কোন নিয়মনীতি পালন করা হতো না। যখনই কেউ লেখা পড়া করতে আসতো, তাকে পাঠে শরীক করে নেয়া হতো। আরবি মাদ্রসাগুলোতে অবশ্য ভর্তির সময় ছিলো শাওয়াল মাস। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে একমাস পরেও ভর্তি করা হতো।

৯. ভর্তির বয়স

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলামানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে বয়সের কোন প্রশ্ন ওঠেনা। যখনই কোনো ব্যক্তির বোধদয় হতো তখনই সে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতে পারতো। মাদ্রসাগুলো তাকে সহযোগিতা করতো। বয়সের ভিত্তিতে কোনো তারতম্য করা হতো না। কেউ কেউ অধিক বয়সে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতেন। সাধারণভাবে মাদ্রসাগুলোতে বালকদের সাথে বয়স্কদেরও দেখা যেতো।

১০. শ্রেণী বিন্যাস

সে সময় মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে শ্রেণী বিন্যাস পন্থা ছিলো না। শিক্ষার কাল বছর দ্বারা গণনা না করে পাঠ্য পুস্তক দ্বারা করা হতো। বলা হতো এ ছাত্র অমুক অমুক কিতাব পড়েছে, বা অমুক কিতাব পড়া বাকি আছে। প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথক পৃথক (পাঠ দেয়া হতো)। প্রত্যেকের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি রাখা হতো। কেউ কেউ দ্রুত কিতাব শেষ করতে পারতো। আবার কেউ কেউ দীর্ঘদিন একই কিতাব নিয়ে পড়ে থাকতো। সকল ছাত্র একত্রে বসে তাদের পাঠ মুখস্থ করতো।

১১. শিশু শিক্ষার সূচনাকাল

শিক্ষিত মুসলিম পরিবারসমূহে প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা চলে আসছিল যে, তাদের সন্তানরা যখন চার বছর চার মাস চারদিন বয়সে উপনীত হতো, তখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শিক্ষাদান শুরু হতো। এ অনুষ্ঠানকে বিসমিল্লাহর অনুষ্ঠান বলা হতো। এটা একটা উৎসব অনুষ্ঠানে পরিণত হতো। অভিভাবকগণ তাদের বন্ধু বান্ধবদের এ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করতেন। নির্দিষ্ট শিক্ষক উপস্থিত থাকতেন। তিনি রাব্বি ইয়াসসির ওলা তু আসসির ওয়া তামমিম বিল খায়ির, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িয়ে অতপর সূরা আলাকের প্রথমিক কয়েকটি আয়াত এবং সূরা ফাতিহা পড়িয়ে দিতেন। শিশু এ পাঠ আওড়াতে থাকতো। উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হতো। অভিভাবকের সামর্থনুযায়ী অনুষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইনাম পেতেন।

১২. শিক্ষার সময়সূচি

মকতব ও মাদ্রসাগুলোতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ হয়ে বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতো। অবশ্য আরবি মাদ্রাসাগুলো আসর পর্যন্ত চলতো। মাঝখানে যোহেরের নামায ও খাবারের বিরতি হতো। কোনো কোনো শিক্ষক চূড়ান্ত পর্যায়ের ছাত্রদের এশা ও তাহাজ্জুদের পরও পড়াতেন। পড়া লেখার যাবতীয় কাজ মাদ্রসাতেই সম্পন্ন করা হতো।

১৩. সাপ্তাহিক ছুটি

শুক্রবার ছিলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। বৃহস্পতিবারে অর্ধদিবস পর্যন্ত মাদ্রাসা খোলা থাকতো। এ সময়টাও মসজিদ বা মাদ্রাসার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যয় হতো। কোনো কোনো আরবি মাদ্রসায় মঙ্গলবারে পাঠদান হতো না। সেদিন ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকের কটি তৈরি করতো। শিক্ষকগণ গ্রন্থ রচনার কাজ করতেন।

১৪. বার্ষিক ছুটি

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় সারা বছরই পড়ালেখা চলতো। ছুটি থাকতো খুবই কম। বার্ষিক ছুটি মোটামুটি নিম্নরূপ ছিলো:

১. ঈদুল ফিতর ২দিন
২. ঈদুল আযহা ৫দিন
৩. মুহাররম ৬দিন [বাংলাদেশে]
৪. সফর মাসের শেষ বুধবার ১দিন [বাংলাদেশে]
৫. শবে বরাত ১দিন
মোট ১৫দিন।

১৫. খেলাধূলা

বর্তমান যুগের মতো তখন খেলাধুলার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হতোনা। খেলাধুলায় সময় অপচয় করতে নিষেধ করা হতো। মাদ্রাসাগুলোতে খেলাধূলার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিলো না। অবশ্য কোথাও কোথাও ছাত্র

শিক্ষক সকলে মিলে ব্যায়াম করতেন। কোথাও কোথাও যুদ্ধ বিদ্যার প্রশিক্ষণ হতো। ইমাম গাযালি প্রমুখ শিশুদের জন্যে খেলাধূলা অপরিহার্য মনে করতেন।

১৬. শাস্তি

শিষ্টাচার বা আদব শিক্ষাদানের জন্যে সে যুগে শাস্তি বা দন্ড প্রদানকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হতো। এ ক্ষেত্রে ছোট ছোট ব্যাপারেও ছাত্রদের শাস্তি দেয়া হতো। ভর্তির সময় অভিভাবকগণ বলে যেতেন: হাড় আমাদের শরীর আর চামড়া আপনাদের। কোনো কোনো শিক্ষক দন্ডদানে বিশেষভাবে খ্যাতিমান হয়ে উঠতেন। বেয়াড়া এবং পলাতক ছাত্রদের খুঁজে বের করে পিটাতে পিটাতে মাদ্রাসার আনা হতো। শিক্ষাকে তখন কোন ঐচ্ছিক ব্যাপার মনে করা হতো না। বরং শিক্ষা ছিলো আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক। তাই লেখা পড়ায় ছাত্রদের সামান্যতম অলসতাও কঠোর দৃষ্টিতে দেখা হতো।

১৭. খাদ্য

মাদ্রাসায় খানা পাকানোর ব্যবস্থা ছিলো না। এলাকাবাসীরাই ছাত্রদের খাবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন। ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতো অথবা মাদ্রাসায় এনে ছাত্র শিক্ষক সকলে মিলে একত্রে খাবার খেতো।

১৮. থাকা

স্থানীয় ছাত্রদের বলা হতো মুকীম। দূরাগত ছাত্রদের বলা হতো মুসাফির। মুসাফির ছাত্ররা মাদ্রাসা কক্ষে কিংবা মসজিদের হুজরায় থাকতো। চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়তো। লজিং থাকার প্রথাও ছিলো।

১৯. শিক্ষা সমাপন

মেধাবী ছাত্ররা ১৪/১৫ বছর বয়সেই ফার্সি ও আরবি মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপন করতো। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবি পনের বছর বয়সে শিক্ষা সমাপন করেন। যাদের মেধাশক্তি কম ছিলো, শিক্ষা সমাপন করতে তাদের আরো কয়েক বছর বেশি সময় লাগতো।

২০. সমাবর্তন

সকল ফার্সি ও আরবি মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হতো। এতে বড় বড় আলিমদের দাওয়াত দেয়া হতো। সেখানে ফাতিহা পাঠ করে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের জন্যে দোয়া করা হতো। অতপর কোনো একজন বুযর্গ তাদেরকে উপাধিতে ভূষিত করতেন। এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে ফাতিহা ফেরাগ বলা হতো।

২১. উপাধি

সে আমলে ফার্সি মাদ্রাসা সমাপনকারীকে মুন্সি এবং আরবি মাদ্রাসা সমাপনকারীকে আলিম খেতাব দেয়া হতো। মুগল আমলের পূর্বে চূড়ান্ত ইলম হাসিলকারীকে দানিশমন্দ বলা হতো। মাওলানা গোলাম আলী

আযাদের [মৃত্যু ১৭৮৫খৃ:] যামানায় দানিশমন্দের পরিবর্তে মৌলভী খেতাব চালু হয়। ফার্সি মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পর ছাত্ররা সরকারি চাকুরীর উপযুক্ত বিবেচিত হতো।

২২. শিক্ষক

ফার্সি মাদ্রাসা শিক্ষকদের মিয়াজি, আখন্দজি কিংবা মোল্লাজি বলা হতো। আরবি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বলা হতো মৌলভি কিংবা মোল্লা সাহেব।

২৩. সর্দার পড়ুয়া

মুসলিম শাসনামলে নামকরা আলিমদের শিক্ষাকেন্দ্রে এ প্রথা ছিলো যে, তারা কোনো উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রকে সর্দার পড়ুয়া নিয়োগ করতেন। উস্তাদ যা পড়িয়ে যেতেন সে তার পুণরালোচনা ও ব্যাখ্যা করতো। এরূপ ছাত্রকে মূয়ীদ বা মনসবদার বলা হতো।

২৪. পাঠ্য বিষয়

আগেই বলেছি, শিক্ষা বিভাগ বলে সরকারের তখন কোনো বিভাগ ছিলো না। শিক্ষানীতি ও শিক্ষার বিষয় প্রণয়নে সরকারের কোন হাত ছিলো না। বড় বড় আলিম ও শিক্ষকগণই এ দায়িত্ব পালন করতেন। শিক্ষানীতি, পাঠ্য বিষয়, পাঠ্য তালিকা তারাই প্রণয়ন করতেন। শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারি হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা বরং বহু শাসক ও সুলতানের প্রশাসনেই আলিমদের বিরাট প্রভাব ছিলো।

২৫. পাঠ্য তালিকা : মকতব

১. সর্বপ্রথম কায়দায়ে বাগদাদি পড়ানো হতো।
২. অতপর কুরআন শরীফের ৩০তম পারা (আমপারা) পড়ানো হতো।
৩. আমপারা শেষ হবার পর গোটা কুরআন মজীদ খতম করানো হতো। কুরআন মজীদ খতম করার আগে অন্য কোন কিতাব পড়ানো হতো না।
৪. কুরআন মজীদ খতমের পর কারিমা প্রভৃতি চরিত্র গঠনমূলক ফার্সি বই পড়ানো হতো।
৫. অযু এবং নামায শিখানো হতো। সকল ছাত্রকেই (আসর) নামাযের জামায়াতে শরীক হতে হতো।

২৬. শিক্ষাদান পদ্ধতি : মকতব

১. শিক্ষক ছাত্র সকলেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে পাঠ আরম্ভ করতেন।
২. ছাত্ররা বিছানায় উস্তাদের সম্মুখে আদবের সাথে হাঁটু পেতে বসতো।
৩. ছাত্রদের প্রথমে বিগত পাঠ শুনাতে হতো। তা শুনাতে পারলেই নতুন সবক (পাঠ) দেয়া হতো।
৪. বৃহস্পতিবারে নতুন করে সবক দেয়া হতো না। সেদিন বিগত সাত দিনের পড়া শিক্ষক শুনতেন। শিশুরা সাধারণত সাত/আট বছর বয়সেই কুরআন পড়ে শেষ করতো। পূর্ণ কুরআন খতম করার পূর্বে কোনো ছাত্রই অন্য কোন শিক্ষা আরম্ভ করতে পারত না।

২৭. পাঠ্য বিষয়: ফার্সি মাদ্রসা

সুলতান মাহমুদ গযনভীর শাসনকাল থেকে নিয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল পর্যন্ত (১০৩০-১৮৩৫খৃ:) ফার্সি ছিলো এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। সে জন্যে এদেশে ব্যাপক হারে ফার্সি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্ররাও পড়তো। ফার্সি ভাষা ছাড়াও জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাও দেয়া হতো। এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বিষয় ছিলো মোটামুটি নিম্নরূপ:

১. ফিকাহ
২. আখলাক: এতে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকও অন্তর্ভূক্ত হতো। যেমন : নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি।
৩. ইতিহাস: ইতিহাসের সাথে কিসসা কাহিনীও পড়ানো হতো।
৪. ভাষা ও সাহিত্য: এতে ফার্সি গদ্য ও পদ্য পড়ানো হতো।
৫. পত্র: এর দ্বারা চিঠিপত্র ও দরখাস্ত দস্তাবিজ ইত্যাদি লেখা শিখানো হতো।
৬. গণিত: এতে ব্যবসা বাণিজ্য ও হিসাব শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞানদান করা হতো।
৭. খোশ নবিশি (সুলেখা)
ফার্সি মাদ্রাসায় শিক্ষার মেয়াদ কতো বছর ছিলো তা বিস্তারিতভাবে কিছু জানা যায়না। নবাব মির্জা দাগের (১২৪৭-১৩২৫ হি:) একটা পত্র থেকে জানা যায়, তিনি তিন বছরে ফার্সি মাদ্রাসার পড়ালেখা শেষ করেন।

২৮.শিক্ষাদান পদ্ধতি: ফার্সি মাদ্রাসা

১. কুরআন মজীদ খতম হবার পর পরই ফার্সি ভাষা শিক্ষাদান শুরু হতো।
২. মুখস্ত করার প্রতি জোর দেয়া হতো।
৩. ছাত্ররা শুনে এবং পড়ে পাঠ মুখস্ত করতো।
৪. প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথকভাবে পাঠদান হতো। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।
৫. তৃতীয় পহর সুলেখা এবং অংকের জন্যে নির্দিষ্ট থাকতো।
৬. সাধারণত বুধবারের নতুন কিতাবের সবক দেয়া হতো।

২৯. পাঠ্য বিষয়: আরবি মাদ্রাসা

মুসলিম শাসনামলে এদেশে আরবি মাদ্রাসাগুলোই ছিলো উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামি শরীয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্ক আরবি ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো। আরবি মাদ্রাসাগুলোতে পাঠ্যগ্রন্থ নির্বাচনে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের উপযুক্ত গ্রন্থাবলী পাঠ্য তালিকাভূক্ত করা হতো। শেষ পর্যায়ে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হতো। পাঠ্য গ্রন্থবলী পরিবর্তন করা হতো খুব কমই। মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন সময় আরবি মাদ্রাসাগুলোতে মোটামুটি নিম্নরূপ পাঠ্য বিষয় চালু ছিলো:

১. ইলমে সরফ,
২. ইলমে নাহু,
৩. উসূলে ফিকাহ,
৪. ফিকহ,
৫. তাফসীর,
৬. হাদীস,

৭. ইলমে কালাম,
৮. মানতিক, ফালসাফা (দর্শনশাস্ত্র)
৯. তাসাউফ,
১০. আরবি সাহিত্য (গদ্য ও পদ্য)

৩০. শিক্ষাদান পদ্ধতি: আরবি মাদ্রাসা

পাঠ্য গ্রন্থাবলীর গুরুত্ব ও আকারের প্রেক্ষিতে সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে পাড়ানো হতো।
১. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি: এ পর্যায়ে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য বুঝাতেন। এ পদ্ধতি আধুনিক কালের Lecture method এর অনুরূপ।
২. মধ্যম পদ্ধতি : এ পর্যায়ে ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র প্রভৃতিও আলোচনার অন্তর্ভূক্ত ছিলো। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হতো। সন্দেহ সংশয়ের নিরসন করা হতো এবং সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হতো। এটা ছিলো সুক্ষ্ম INTENSIVE অধ্যয়ন পদ্ধতি।
৩. ব্যাপক আলোচনা পদ্ধতি: এ পর্যায়ে উপরোক্ত দু'প্রকারের আলোচনা ছাড়াও ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং উপমা উদাহরণের মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার চেষ্টা করা হতো। এটা ছিলো ব্যাপক (EXTENSIVE) অধ্যয়ন পদ্ধতি।

৩১. দরসে নিযামি মাদ্রাসা

মোল্লা কুতুবুদ্দীন নামে একজন বিখ্যাত আলিম মাদ্রাসাসমূহের তৎকালীন সিলেবাস সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটা নতুন সিলেবাস তৈরী করে যান। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীন {মৃত্যু ১৭৪৭ খৃ:} পিতার পদ্ধতিতে আরো অধিক চিন্তা ভাবনা করে প্রত্যেক বিষয়ে দু'দুটি কিতাব নির্বাচন করে নতুন সিলেবাস চালু করেন। তার নাম অনুযায়ী এ সিলেবাসের মাদ্রাসাগুলো দারসে নিযামি মাদ্রাসা নামে অভিহিত ছিলো।

৩২. নারী শিক্ষা

মুসলিম শাসনামলে নারী শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হতো। মুসলমানগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের কন্যা সন্তানদের পড়া লেখা করাতেন। মেয়েরা ব্যাপকহারে মকতবে কুরআন শিক্ষা করতো। দিল্লীর এক সময়ের একজন শাসক ছিলেন একজন নারী, সুলতানা রাজিয়া। তিনি ছিলেন একজন বিদূষী মহিলা। তিনি কয়েকটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বতুতা [১৩০৩-১৩৭৭] তার ঐতিহাসিক সফরে এদেশে তিনটি মহিলা মাদ্রাসা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন খরজীর মহলে দশ হাজার মহিলা ছিলো। মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে হাজার হাজার হাফেযা, কারিরা, দীনের আলেমা ও শিক্ষিকা ছিলেন। মুসলিম আমলে শিক্ষার দিক থেকে এ দেশে নারীদের খুবই খ্যাতি ছিলো।

৩৩. চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষা

মুসলিম আমলে চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা ছিলো বলে জানা যায় না। তবে এসব বিদ্যায় বহু দক্ষ মুসলমানের নাম জানা যায়। এ থেকে অনুমান করা যায়, হয়তবা কোনো কোনো মাদ্রাসায় এসব বিষয়েও শিক্ষাদান করা হতো। এসব শাস্ত্রের বিশষজ্ঞগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। মুসলিম আমলের ব্যাপক স্থাপত্য নিদর্শন থেকে বুঝা যায় যে, তখন সুদক্ষ কারিগর তৈরি হতো।

৩৪. উপসংহার

মুসলিম শাসনামলে এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা এতোক্ষণ আমরা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, যে শিক্ষা ব্যবস্থা শত শত বছর ধরে এদেশে প্রচলিত ছিলো, তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিলো আল্লাহর একত্ব এবং আখিরাতে তাঁর সম্মুখে জবাবদিহির সুদৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গির সীমা পরিসীমা অতিক্রম করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো দক্ষ মানুষ তৈরির কারখানা। গোটা ইসলামি হুকুমাত পরিচালনার জন্যে সর্ব প্রকার দক্ষ মানুষ এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই তৈরি হতো।

উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন:

আমরা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে মুসলমানরা কেবল রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীই ছিলো না, বরং জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বুদ্ধি ও মেধাগত দিক থেকেও তারা ছিলো শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।...... তাদের হাতে ছিলো এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যাকে কোনো অবস্থাতেই খাটো করে দেখা যায় না। এতে ছিলো উন্নত নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের সু-ব্যবস্থা।

মাওলানা মওদূদী (রহ.) মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এক পর্যালোচনায় বলেন:

তখন আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো, তা সময়ের দাবি ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিলো। এ ব্যবস্থার এমন সকল বিষয়ই পড়ানো হতো, যা তখনকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিলো। তাতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই প্রদান করা হতো না বরং সে শিক্ষা ব্যবস্থায় দর্শন, মানতিক, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু যখন সে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, যার প্রেক্ষিতে আমরা গোলামে পরিণত হলাম, তখন এ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও আজ পর্যন্ত এখানে আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়নি। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থা চলে আসছে আরো আগে থেকে।

মুসলিম শাসনামলে ভারত উপমহাদেশে চালু ছিলো ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা। সে শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হতো আদর্শ নাগরিক, আদর্শ মুসলিম এবং দেশ পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ নেতৃত্ব ও জনশক্তি।

কিন্তু ১৭৫৭ সাল থেকে যখন ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করে নিতে থাকে, তখন থেকে তারা এ দেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার বন্দবস্ত করে, যে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা তাদের মানসিক গোলাম হিসেবে তৈরি হবে। তাদের খাদেম ও সেবক হয়ে কাজ করবে এবং মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেও সত্যিকার খাদেম ও সেবক হয়ে কাজ করবে এবং মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেও সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠবে না। তারা সে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পর নানা ভাবে তার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে। এবং ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সরকারি যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা উঠিয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাহীন ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা তার শৌর্যবীর্য হারিয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা জমে উঠে। চাকুরি বাকরিসহ বস্তুগত জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্যে তখন এই শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

সেই থেকে এদেশে চালু হয় দ্বি-মুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। অর্থ্যাৎ দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি হলো বৃটিশদের বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। আর অপরটি হলো পূর্ব থেকে চলে আসা মুসলামানদের ধর্মীয় তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে।

এ সময় মুসলমানরা রাষ্ট্র ও ক্ষমতা হারিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ার কারণেই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে সেকেলে হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি করবার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার সময় ভারত বিভক্ত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় ভারত।

মুসলমানরা স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেছিল ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনার জন্য। তাদের আদর্শিক ঐতিহ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতি চালু করবার জন্য। কিন্তু যারা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে, তারা মুসলামনদের এই প্রাণের দাবির সাথে গাদ্দারি করে। তারা পাকিস্তানে কিছুতেই ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও চালু করেনি। ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেনি। তারা ইংরেজদের চালু করে যাওয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা সবই হুবহু বহাল রাখে। কিছু সংস্কার সংশোধন করলেও ইসলামের পক্ষে তেমন কিছুই করেনি। কেবল মুসলমান জনগণের প্রবল চাপের মুখে বাধ্য হয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান নামের সাইন বোর্ডটি গ্রহণ করে। ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা

বাস্তবায়ন করেননি। অতপর চব্বিশ বছরের মাথায় পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যায় পাকিস্তান হিসেবে।

স্বাধীন বাংলাদেশেরও আটত্রিশ বছর বিগত হলো। আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে আজও চালু হয়নি। জনগণের প্রাণের দাবি ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

১৯৭১-র স্বাধীনতার পর কয়েকবারই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। ডঃ কুদরাত-এ-খুদা, মজীদ খান ও প্রফেসর মফিজ উদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রথম কমিশনটি ছিলো ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন। এ কমিশনের রিপোর্টের উপর বিগত ৪ ফেব্রুয়ারি ৯৭ তারিখে ঢাকাস্থ হোটেল সুন্দরবনে একটি আলোচনা সভার স্বাগত ভাষণে আমি বলেছিলাম:

আপনারা জানেন, ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই তৎকালীন সরকার কর্তৃক ড:কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। একই সালের ২৪ সেপ্টেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের উদ্বোধন করেন। কমিশন সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাসব্যাপী সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতপর কমিশন সরকারি প্রস্তাবের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর নিকট অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট গ্রহণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ভূমিকা-)

আপনারা একথাও অবগত আছেন, ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরির্তনের পর উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়টিও নিশ্চয়ই আপনাদের দৃষ্টি এড়ায়নি যে, বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই উক্ত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কিমিশনই রিপোর্টকে গণমুখী ও যোগপযোগী করে একটি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নে উদ্দেশ্যে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও গঠন করেছে।

একথাতে তো কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের জন্যে অবশ্যি একটি যুগোপযোগী বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রয়োজন। কিন্তু যুগোপযোগী এবং বাস্তবভিত্তিক কথা দুটি আপেক্ষিক। এ দুটি কথাই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিবেচিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকেও গণমুখী, যুগোপযোগী এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা রিপোর্ট বলা হয়েছিল। এ রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়: আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সুপারিশসমূহ বাস্তাবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রের এ অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা হবে।

নবদিগন্ত সূচনাকারী সেসব সুপারিশ কি? উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে আমি কয়েকটি সুপারিশ আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি:

১. কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্চিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। (অধ্যায়: ১:১)
২. আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে

জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যেন এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। (অধ্যয় : ১: ২)
৩. সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির সকল নাগরিকদের ....শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। (অধ্যায় : ১:২)
৪. নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীল সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুনাবলী বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। (অধ্যায়: ১:৯)
৫. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশেকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। (অধ্যায় ২:৩)
৬. সমগ্র দেশে সরকারী ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচি ভিত্তিক এবং অভিন্ন এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (অধ্যায় ৭:৯)। (অর্থ্যাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবে না)।
৭. প্রাথমিক শিক্ষার পঠিতব্য বিষয় : সাপ্তাহিক পিরিয়ড: প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা থাকবে না। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সপ্তাহে ধর্ম শিক্ষার ২টি করে পিরিয়ড থাকবে। (অধ্যায় ৭:১০)
৮. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে ধর্ম শিক্ষার একই শিক্ষা পরিবেশ শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত। (অধ্যায় : ৭:১০) । অর্থ্যাৎ সহশিক্ষা।
৯. নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলত দ্বিধাবিভক্ত হবে: (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা। (অধ্যায় ৮:৫)। (ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে না)।
১০. মাদ্রসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য। (অধ্যায়: ১১:২)
১১. বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পূর্ণগঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম আধ্যায় বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (১ম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রবর্তিত হবে। (অধ্যায় ১১:৩)। অর্থ্যাৎ মাদ্রাসা থাকবে না।

এ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব ও কর্মমূখী করার জন্যে অনেকগুলো প্রস্তাবই আছে। তবে সেই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতির ঈমান আকীদা, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার একটা পরিকল্পনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামি আদর্শের বিপরীত বিশেষ ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট সুপারিশ এই রিপোর্টে রয়েছে। সুতরাং এ রিপোর্টকে কতটা গণমুখী ও বাস্তব ভিত্তিক বলা যায়? বর্তমান সরকার উক্ত কমিশনের সুপারিশমালাকে বাস্তবভিত্তিকে করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে যে কমিটি গঠন করেছে, সে কমিটি কি কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশমালায় সন্নিবেশিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাবে? জাতির ঈমান আকীদা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা কি তারা চিন্তা করবে? তারা কি পারবে ইসলামি আদর্শভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে? দীনি শিক্ষার অস্তিত্ব বজায় রাখতে?

সরকার কমিটি সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করার পর জাতি হতাশ হয়েছে। ইতোমধ্যেই এ কমিটির ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় বিরুপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কমিটি জাতির প্রত্যাশিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে বলে সচেতন মহল মনে করতে পারেছ না। ফলে ইসলামি শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।১

সরকার ড: কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে বাস্তবভিত্তিক ও যুগোপযোগী করার জন্য যে কমিটি গঠন করেছে (জানুয়ারি ৯৭তে), সে কমিটিকে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা প্রদানের জন্যে সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ ২১

১. দ্রষ্টব্য : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা গ্রন্থ প্রকাশক: সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, জুন ১৯৯৭।
মার্চ ৯৭ তারিখে ন্যাম এ এক সেমিনার কাম ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে স্বাগত ভাষণ প্রদানকালে আমি বলেছিলাম:

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু নীতিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে বিভ্রান্ত করে। শিক্ষা অবশ্যই এমন হতে হবে, যে, শিক্ষা মানুষকে স্রষ্টামুখী করে এবং সাথে সাথে জীবন ও জগৎকে সঠিক নীতি ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। তাই শিক্ষানীতি আমাদের লাগবেই। আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের মধ্যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, আকিদা, কোন ঐতিহ্য চেতনা এবং কিসের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চাই? অর্থ্যাৎ আমরা আমাদের শিক্ষা দর্শনকে কোন ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাই? একথাতো পরিষ্কার, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ভিত্তি বানানো না হয়, তাহলে Stanly Hull এর কথাই যথার্থ। তিনি বলেছিলেন, তিনটি R অর্থ্যাৎ Reading, Writing এবং Arithmetic এর সাথে যদি নৈতিকতার শিক্ষা না থাকে তাহলে আপনি ৪র্থ R মানে Rascal-ই পাবেন। অর্থ্যাৎ সেক্ষেত্রে শিক্ষাথীর্রা Rascal হতে বাধ্য। মহাকবি W.B.Yeats বলেছিলেন:

I heard an old religious man
But yesternight declare
That he had found & text to prove
That only God, my dear,
Could love you for your self alone
And not for your yellow hair.

হ্যাঁ, কেবল আল্লাহই মানুষকে সত্যিকার ভালোবাসেন। তাই কেবল তাঁর বিধানই মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের গ্যারান্টি। মানব কল্যাণের শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল আল্লাহ বিধানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে। অপরদিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে এতোটা উন্নত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এ প্রতিবেদনের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বল হয়েছে:

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক,ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্র সুনাগরিকের গুলাবলির বিকাশ ঘটানো।
৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।
৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।
৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।
১০. দেশর জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।
১২. শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender bias) দূর করা।
১৩. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।
১৪. পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা। ৩
৩. পরিবেশ : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা: ৯,৪০।

এখানে ২নং পয়েন্ট সুস্পষ্ট ও অকাট্য কথা বলে দেয়ার পর ৩ নং পয়েন্ট মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি, তা উহ্য ও অস্পষ্ট রেখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া ৬,৭ ও ৯ নং পয়েন্টসমূহ খুবই বিভ্রান্তিকর। এছাড়া এ প্রতিবেদনের ভেতরেও মাঝে মাঝে বেশ বিভ্রান্তিকর সুপারিশ করা হয়েছে।

এযাবৎ যতোগুলো শিক্ষা কমিশন রিপোর্টই প্রকাশ হয়েছে, তার কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। তবে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে বিভিন্ন সময় সংস্কার করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলাম, বিজ্ঞান,প্রযুক্তি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে এখনো ঢেলে সাজানো হয়নি।

আমাদের দেশে এখনো মূলত সেই ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটি হলো ট্রেডিশনাল মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আর অপরটি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিবর্জিত আর অপরটি ইসলামি আদর্শ বিবর্জিত। তাই এক ধারার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আরেক ধারার শিক্ষার্থীরা সুধারণা পোষণ করে না। আদর্শ মুসলিম জাতি গঠনের জন্যে এর কোনো ধারাই এখন আর উপযুক্ত নয়। উভয় ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা

ইংরেজরা আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে গেছে সেটাকেই আমরা বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বলছি। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিরেট কতিপয় উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। তাই এটাকে বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

ইংরেজ শাসকরা এদেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিলো ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে থেকে একদল শিক্ষিত মানসিক গোলাম ও প্রভু ভক্ত লোক তৈরি করা, যারা জাতিগতভাবে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু মানসিকভাবে হানাদার শাসক ইংরেজদের ধ্যান ধারণায় পরিগঠিত হবে। বৃটিশরা এসেছিল এদেশে শাসন শোষণ করতে। তাই এদেশীয়দের মধ্যে থেকে তাদের এমন একদল লোক প্রয়োজন ছিলো, যারা তাদেরেক প্রভু মনে করবে, তাদের সভ্যতা সস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, তাদের আচার আচরণ ও চিন্তা দর্শনকে চমৎকার মনে করবে এবং একান্ত অনুগত বাধ্যগত দাসের ন্যায় দেশ পরিচালনার কাজে তাদের সেবা সহযোগিতা করবে। যে ব্যক্তি তাদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে যতো বেশি নিষ্ঠার সাথে সেবা করবে সে নিজেকে ততোবেশি গৌরবান্বিত মনে করবে। তাদের নিজেদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তা ছিলো রাজ্য শাসন, রাজ্য বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা দর্শন বিস্তারের উপযোগী লোক তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। সুতরাং নিজেদের দেশে তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, তা তৈরি হচ্ছিলো সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত লোক আর জবর দখল করা দেশগুলোতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তা থেকে লাভ করছিল প্রভু ভক্ত ও আনুগত্য পরায়ণ লোক। এভাবেই তারা শাসক ও সেবক শ্রেণীর লোক তৈরি করছিল। তাদের চালু করে যাওয়া সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের দেশে এখনো চালু আছে। এই বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাটিই আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে চালু রয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে একটি স্বতন্ত্র ও আদর্শ সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এ শিক্ষা আমাদের জাতিকে মানসিকভাবে করেছে বহুগামী। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, কিন্তু আমাদের চিন্তাধারা বিচিত্রগামী। এই শিক্ষার অসংখ্য ত্রুটি আছে। তবে এর প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা: বৃটিশদের চালু করে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কার ও মেরামতের কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারা নিরেট আল্লাহ বিমুখ জড়বাদী দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর জবাব নাস্তিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিংবা সংশয়বাদী ধারণা পেশ করা হয়েছ। এই বিশ্ব জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনিই যে গোটা মহাবিশ্ব অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিচালনা করেছেন, তিনিই যে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবন যাপনের জন্যে জীবন দর্শন ও জীবন বিধান দিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুপুস্থিত।

২. ঈমানি দর্শন বর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে সঠিক জীবন দর্শন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ, আল্লাহর একত্ব, রিসালাত, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত, পরকাল, আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি ঈমানি দর্শনের ধারণা বিবর্জিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা আর্দশবাদী মানুষ তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরকাল বিমুখ দুনিয়া পূজারী মানুষ তৈরি করে। মানুষকে তার শাশ্বত জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা এখানে নেই। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ, জীবনের আসল ব্যর্থতা ও সার্থকতা জানবার ব্যবস্থা এখানে নেই। ঈমান বিবর্জিত বস্তুবাদী দর্শনই এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

৩. জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা : আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাই যেহেতু আল্লাহ বিমুখ ও ঈমান আকীদা বিবর্জিত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আদর্শিক জীবন ও জীবন পদ্ধতি লাভ করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। মহান আল্লাহ অহী ও নবুওয়তের মাধ্যমে মানুষের জন্যে যে হিদায়াত ও জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থা সে সম্পর্কে নীরব। শুধু নীরবই নয়, বরং

বিরূপ। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা না ইসলামি জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে, না সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠতে পারছে আর না জীবন যাপনের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে। এর ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে বহুরংগী জীবন যাপনের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

৪. প্রকৃত লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা: ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মাঝে এক আল্লাহর গোলামি করার প্রবণতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তিলাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা, আল্লাহ প্রদত্ত সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফত পরিচালনা এবং মানবতার সেবা করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা জীবনের কোনো মহত লক্ষ্য অর্জন করেনা এবং উপরোল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুনাবলী ও যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনা।

৫. নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা: এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে ছেড়েছে। গোটা জাতিকে নৈতিক অধ:পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এখানে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির কোনো মানদন্ড নেই। আদর্শ ও লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফল এ রকমই হয়। যে শিক্ষা ব্যবস্থা এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেনা, পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করেনা, আদর্শ জীবন পদ্ধতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেনা, সে শিক্ষা ব্যবস্থাতো আদতেই মেরুদন্ডহীন। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার কুফলে আমাদের জাতি দিন দিন নৈতিক অধ:পতনের দিকে তলিয়েই চলেছে।

৬. নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থতা: আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বৃটিশদের মানসিক দাস আর অনুগত সেবক তৈরি করার জন্য। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবার আশা করা যায়না। নিজ দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগী শিক্ষিত মানুষ এখান থেকে বের হবার আশা করা যায়না। তাইতো দেখা যায়, জাতির মেধাবী লোকেরা স্বদেশ থেকে বিদেশকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

৭. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টিতে ব্যর্থতা : এ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে বহুমত ও পথের অধিকারী বানিয়ে দেয়। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মানসিকভাবে পারস্পরিক শত্রু হয় গড়ে উঠে। ছাত্র জীবন শেষে তারা বিভিন্ন মত ও পথে পরিচালিত হয় এবং জাতিকেও বিভিন্ন পথ ও মতের দিকে ধাবিত করবার চেষ্টা করে। ফলে জাতির মধ্যে দিন দিন হানাহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনৈক্য প্রসারিত হচ্ছে। ঐক্য ও সংহতির বন্ধন একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে। জাতি অসংখ্য মত ও পথের অনুসারী হয়ে পড়েছে।

৮. সংকীর্ণ মতপার্থক্য সৃষ্টি ও লালন করা এ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. সন্ত্রাস : এ শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক দেউলিয়াত্বের কারণে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সন্ত্রাস আজ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এখানকার শিক্ষকরা পর্যন্ত সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত জীবনবোধ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। **১১.** এ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বার্থপর, স্বার্থন্বেষী নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির লোক তৈরি করছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি অকল্যাণকর বৈশিষ্ট হলো সহশিক্ষা। সহশিক্ষা শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামি জীবনবোধ ও মূলবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার চরম কুফল জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

১২. দুর্নীতির প্রসার: দুর্নীতি আমাদের জাতি সত্তার অংশে পরিণত হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে জঘণ্য ঘুষখোর, চোরাকারবারী, মানুষের অধিকার হরণকারী, আইনকানুন ও নিয়মশৃংখলা লংঘনকারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, স্বজনপ্রীতিকারী, যুলুমবাজ, মদখোর, জুয়াবাজ, ফাঁকিবাজ, প্রতারক, চোর, ডাকাত ইত্যাদি। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যে, আদর্শ মানুষ তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছে এর বিপরীত ফল। আমরা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছি, যা দুর্নীতি শিক্ষা দিচ্ছে এবং এর শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির কাজে দক্ষ হয়ে বেরুচ্ছে। **১৩. ধর্মীয় শিক্ষার লেজুড়:** অবস্থার প্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ধর্মীয় ভাবধারার সাথে ইসলামিয়াত ও ইসলামের ইতিহাসের লেজুড় জুড়ে দেয়া হয়। ইসলামিয়াতকে নিচের শ্রেণীগুলোতে কখনো ঐচ্ছিক, কখনো বাধ্যতামূলক রাখা হয়। উক্ত শ্রেণীতে ইসলামিয়াত ও ইসলামের ইতিহাস ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়।

ইসলামের ইতিহাস নামে এমন ইতিহাস ছাত্রদের পড়ানো হয়, যাতে ইসলামকে বিকৃত এবং ইসলামের ইতিহাসকে স্বার্থপরতা ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা পাশ করে বের হয় তারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। বরং অনেকেই একেবারে ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে বের হয়। ইংরেজ শাসকরা মুসলিম যুবকদের ইসলাম বিদ্বেষী বানাবার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ইসলামের ইতিহাস বিভাগ চালু করে। অমুসলিমদের লেখা ইতিহাস এখানে ছাত্রদের পড়ানো হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে ইসলামকে একটি জঘণ্য মানবতা বিরোধী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে বৃটিশরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি গ্রহণ করে। ইসলামিয়াত বা ইসলামি শিক্ষা নামে এ বিষয়টি চালু করা হয়েছে তাতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়া হয়না। তবে যতটুকু ধারণাই দেয়া হয় তার ফলাফল ইসলামের পক্ষে খুব একটা যায়না। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

পহেলা কারণ হলো, নিচের শ্রেণীগুলোর ইসলামিয়াত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি শিক্ষা বিভাগে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয়না। ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিও গুরুত্বরোপ করা হয়না।

ইসলামিয়াত বিষয়টি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরগাছার মতো। ছাত্রদের অন্য সকল জ্ঞান বিজ্ঞান এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, যার ফলে গোটা বিশ্বজগত আল্লাহ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে এবং সফলভাবে পরিচালিত বলে তারা অনুভব করে। আল্লাহ রসূল ও পরকালের প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুভব করেনা। ছাত্রদের গোটা চিন্তাধারাই এ দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলা হয়। অতপর ইসলামিয়াতের ক্লাসে মৌলভি সাহেব আল্লাহ, রসূল, কিতাব ও পরকাল আছে এবং এগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে বলে শিক্ষা দেন।

একদিকে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের মধ্যে আল্লাহ বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা হচ্ছে, অপরদিকে ইসলামিয়াতে ক্লাসে আল্লাহমুখী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ছাত্রদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামিয়াতের শিক্ষাটা পরগাছার

মতোই থেকে যাচ্ছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে চরমভাবে মার খাচ্ছে। নিরানব্বই মণ লবণের সাথে এক মণ চিনি মিশালে সে চিনি লবণের সাথে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য।

এভাবেই প্রবল আল্লাহ বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে তার উপর আল্লাহমুখী হালকা ধারণা পেশ করে ছাত্রদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয়া হয় এবং সে দ্বন্দ্বে বেচারা পরগাছা ইসলামিয়াত চরমভাবে পরাজিত হয়। এর ফলে ইসলামের বিরোধিতায় তারা সাহসী হয়ে উঠে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কথায় আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চাইতে ঘৃণীত বিভাগ সম্ভবত এটি। এ বিভাগের ছাত্র শিক্ষকরা মোল্লা মৌলবাদী খেতাবে ভূষিত। এ বিভাগের ছাত্রদের কর্মপোযোগী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এ বিষয়ে পাশ করার পর তাদের না সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয় আর না সিভিল প্রশাসনে। কোনো প্রকারে ইসলামিয়াতের শিক্ষকতা করে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাদের সামাজিক মর্যাদাকে হেয় করে দেখা হয়। মোট কথা ধর্মীয় শিক্ষার এই লেজুড় ও পরগাছা থেকে ছাত্ররা:

ক. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জানতে পারে না।

খ. ইসলামকে হানাহানি কাটাকাটির ধর্ম ও মানবতা বিরোধী বলে শিক্ষা লাভ করে।

গ. তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

ঘ. ইসলামকে একটি খেল তামাশার বিষয় হিসেব গ্রহণ করে।

ঙ. এটাকে সমাজের জন্যে কল্যাণকর মনে করা হয় না।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা:

আমাদের দেশে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার দুটি ধারা চালু আছে। একটি হলো দরসে নেজামি পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মূল আদর্শ দেওবন্দ মাদ্রাসা। অপরটি হলো আলীয়া পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সূচনা হয় কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ পদ্ধতি শ্রেণী ভিত্তিক এবং এতে আধুনিক শিক্ষার কিছুটা লেজুড় লাগানো হয়েছে। এই দুই ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে মৌলিক তফাত খুব কমই। মূলত উভয় ধারাই মুসলিম শাসন আমলে ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তারই শিক্ষাক্রমের অনুসারী।
মোটকথা, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ও জরাজীর্ণ। মুসলিম শাসনামলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো যুগ উপযোগী। তখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই সরবরাহ হতো রষ্ট্র নায়ক, রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সামরিক বিভাগের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী কুটনীতিকসহ সকল শ্রেণীর দায়িত্বশীল লোক। এরপর বৃটিশরা এলো। তারা তাদের ধাঁচের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই রাষ্ট্রে কর্মচারী হবার উপযোগী লোক তৈরি করবার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। গোটা বৃটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রচীনত্ব নিয়ে চলতে থাকে। বৃটিশরা চলে যাবার পর দেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তান নামের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। অত:পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রাচীনত্ব নিয়েই সে এখনো ভবিষ্যত্বের পথে এগিয়ে চলেছে।
ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন হয়। দেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিক্ষাক্রমকে বুকে ধারণ করে পাহাড়ের মতো অটল আবিচল হয়ে পড়ে আছে আপন স্থানে।

ফলে যুগ ও কালের যতোই পরিবর্তন হতে থাকলো ততোই এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে থাকলো। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুতে থাকলো, সমকালীন সমস্যাবলী ও জীবনধারার সাথে তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। এখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তাদের জন্যে মসজিদের ইমামতি, মাদ্রাসা ও মক্তব্যের শিক্ষকতা, স্কুলের ধর্ম শিক্ষকের পদ অলংকরণ আর ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কের তুফান ছুটানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দ্বারা জর্জরিত।

১. মূল শিক্ষা ব্যবস্থাটিই বহু শতাব্দীকালের প্রাচীন এবং বর্তমান কালের কার্যকারিতা বর্জিত।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যুগের চাহিদার অনুপূরক নয়।

৩. এখানে যুগ উপযোগী রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচারনীতি, কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা দানের কোনো ব্যবস্থা নেই। এগুলো শেখার জন্যে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা পাশ করার পর পুনরায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। তাও সকল ক্ষেত্রে এবং সকলের জন্যে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না।

৪. এখানে প্রাচীন ফিকহ শাস্ত্রের উপরই অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা এখানে সম্পূর্ণ বন্ধ।

৫. এখানে কুরআনের প্রাচীন তাফসীরই পড়ানো হয়। তবুও পূর্ণাঙ্গ কুরআন পড়ানো হয় না। কুরআনের উপর গবেষণাধর্মী পড়া লেখার কেনো ব্যবস্থা এখানে নেই।

৬. হাদীস শাস্ত্রের একই অবস্থা। হাদীসের উপর গবেষণাধর্মী পড়া লেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। হাদীস যাচাই বাছাই করার মতো যোগ্যতা অর্জন করবার কোনো সুযোগ এখানে নেই।

৭. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করবার শিক্ষা ও কর্মপন্থা জানা যায় না।

৮. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সিভিল সার্ভিসের জন্যে লোক তৈরি হয় না। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হবার যোগ্য লোক তৈরি হয় না। কূটনীতিক তৈরি হয় না। শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি হয় না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ তৈরি হয় না। রাষ্ট্র নায়ক তৈরি হয় না। ফলে এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট গুলোতে তাদের স্থান হয় না।

৯. এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তারা সমাজে সত্যিকারভাবে মর্যাদাবান হতে পারছে না। ধর্মীয় কারণে কিছুটা ভক্তি শ্রদ্ধা তারা লাভ করেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও সামাজিক পদমর্যাদায় তারা অধিষ্ঠিত হতে পারছে না। ফলে সমাজে তাদের ছোট ও হেয় হয়ে থাকতে হয়।

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে দক্ষ জনশক্তি লাভ করা যায় না, সে কারণে মাদ্রাসাগুলো সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও বঞ্চিত।

১১. মাদ্রাসাগুলোতে যারা শিক্ষা দান করেন, তারাও অদক্ষ। তাদেরও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না।

১২. মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বের হয়, অদক্ষতা ও কর্মহীনতা কারণে তারা ব্যাপকহারে ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সারাদেশে ধর্মীয় কোন্দল জাল বিস্তার করে আছে।

১৩. সামগ্রিকভাবে জাতি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি হতাশ ও আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। যেহেতু ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে এখান থেকে শিক্ষা লাভকারীরা সমাজ পরিচালনা ও সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত

করবার যোগ্যতা অর্জন করে না, সেজন্যে অভিভাবকরা সাধারণত তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করান না। কেবল তিনটি কারণে মাদ্রাসায় পড়তে আসে:

ক. একান্ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করার কামনায়।

খ. মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করার পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার নিয়্যতে।

গ. গরীব লোকরা আর্থিক অনটনের কারণে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠায়।

এই তিনটি কারণে যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। ছাত্রের অভাবে বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। টিকে থাকার জন্য বাধ্য হয়ে বহু মাদ্রাসাকে ছাত্র সংখ্যা যা নয়, তার চাইতে বাড়িয়ে দেখাতে হচ্ছে।

এথেকেই বুঝা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সামগ্রিকভাবে অনাস্থা কত প্রবল এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে। মেরামত করে কাজ হবে না। আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এইসব দুর্গতি দেখে বিভিন্ন সময় এগুলোকে মেরামত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলোতে উর্দূ মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলাদেশ আমলে আলীয়া পদ্ধতিতে বাংলা মাধ্যম চালু করা হয়েছে। দরসে নিযামি পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে এখনো সংস্কার করেনি। বিভিন্ন সময় আলীয়া পদ্ধতি বাংলা, ইংরেজি, অংক, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং কোথাও কোথাও কিছু কিছু শ্রেণীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে । কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এগুলো খুব একটা খাপ খায়নি। ফলে এসব মেরামত/সংস্কার দ্বারা মূল অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও বিভিন্ন সময় সংস্কার মেরামত করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন ধরনের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিষয় ও বিভাগ চালু করা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভাবধারায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের। আসলে এ ধরনের আংশিক মেরামত, সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা ফল হবে না। প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, জাতির কল্যাণ ও আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনের দায় দায়িত্ব নিজেদের উপর। নিজেদের জাতিকে উন্নত করে গড়ে তোলা এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিজেদের।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার শতকরা পঁচাশি ভাব নাগরিক মুসলাম। এখানকার মানুষ অত্যন্ত ইসলাম প্রিয়, আল্লাহভক্ত ও ধর্মভীরু। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পিছে পড়ে আছে। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের সম্পদ কম। আমাদের জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুসলিম হিসেবে আমাদের আছে গৌরবান্বিত ইতিহাস। আছে মহান ঐতিহ্য। এক উন্নত অনুপম ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধিকারী জাতি আমরা। আমাদের আছে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। আমাদের কাছে আছে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন দর্শন ও জীবন বিধান। আমাদের জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পূর্ণ নির্ভুল। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির কাছে নির্ভুল জীবন বিধান নেই। সারা বিশ্বে আমাদের দেড়শ কোটি মুসলমান ভাই আছে। তারা আমাদের অংশ। তারা আমাদের সাহায্যকারী ও সহযোগী। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের দেশে চালু করতে হবে নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রণয়ন করতে হবে নতুন শিক্ষানীতি, নতুন কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যতালিকা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলো গতিশীল থাকতে হবে নদীর স্রোতধারার মতো।

এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের একটি আদর্শ ও সুসংহত

জাতিতে পরিণত করবে। আমাদের জাতিকে প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলবে। আমাদের জীবনকে সামগ্রিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করাবে। স্বাধীন মর্যাদাবান জাতি হিসেবে টিকে থাকতে শিখাবে। আমাদেরকে পরকালের মুক্তির পথে পরিচালিত করবে। দক্ষতার সাথে দেশ ও জাতিকে পরিচালনার যোগ্যতা দান করবে।

ইসলামি শিক্ষানীতিঃ একটি মৌলিক প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ মুসলমানের দেশ । এখানকার ৮৭% জন নাগরিক মুসলিম। এদেশের মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর ইসলাম প্রিয়। এখানকার মুসলমানরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের নিদর্শনাবলীর জন্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি। ইসলামি শিক্ষানীতি চালু করার ক্ষেত্রে এখানে কোনো সমস্যাও নেই। কারণ:

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম।

২. বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ (১ক) অনুচ্ছেদ সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছেঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।

৩. এদেশের মুসলমানরা কাজেও ইসলামের ভক্ত-অনুরক্ত এবং ইসলামের জন্যে জান দিতোও প্রস্তুত।

৪. এদেশের ৮৭% জন নাগরিক মুসলমান।

৫. এদেশের মানুষ ইসলামের অবমাননা বরদাশত করে না।

৬. এদেশের রাষ্ট্র প্রধান, সরকার ও সরকার প্রধান সকলেই মুসলমান।

৭. প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরাও মুসলমান।

৮. মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক মুক্তি ও উন্নতির ক্ষেত্রে যে ধর্মের বিকল্প নেই, একথা আজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং অনেক রাষ্ট্র নায়ক কর্তৃক স্বিকৃত হয়েছে। আর ধর্মের ক্ষেত্রে ইসলামই যে সর্বাধিক উদার, বাস্তব, পূর্ণাঙ্গ ও প্রগতিশীল একথাও স্বীকৃত হয়েছে।

৯. তাছাড়া যেহেতু, মূলতই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মূলনীতি ও নির্দেশনা এতে রয়েছে এবং এটি একটি উদার ও সার্বজনীন ব্যবস্থা।

১০. এটি স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ।

১১. ইসলামি শিক্ষানীতি অবশ্যি ইসলামের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া একান্ত জরুরি।

ক. ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

ইসলামি শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী কি হবে, সে সম্পর্কে একটু আগেই আমরা কুরআন হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করে এসেছি। তার আলোকেই আমরা এখানে ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি। অর্থাৎ ইসলামি শিক্ষানীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টসমূহ হবে নিম্নরূপ:

১. শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ ও এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, মালিক, শাসক মাবুদ সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীতি করে তোলা তথা তাদেরকে এক আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা।

২. শিক্ষার্থীদেরকে রিসালাতে বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মাঝে মুহাম্মদ (সা) কে সর্বশেষ নবী ও রসূল হিসেবে মানার এবং তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৩. শিক্ষার্থীদের পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার স্বচ্ছ জ্ঞান ও বুঝ সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাংখা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করা।

৪. আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর দাস (আবদ) ও প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে দেয়া।

৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মপোলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা।

৮. সময় ও সমাজ চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা।

৯. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

১০. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।

১২. সময় ও যুগের চাহিদা মাফিক দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজকর্মী, প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগ পরিচালার উপযুক্ত লোক তৈরি করা।

১৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা।

১৪. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকশিত করা। তাদের মধ্যে ইজতেহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

১৫. সৎ,চরিত্রবান, নীতিবান ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা। উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।

১৬. আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তি লক্ষ্যের মাঝে সমন্বয়ে সাধনের যোগ্যতা অর্জন, জীবনের পূর্ণত্ব অর্জন এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন।

১৭. নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জানা এবং তা সংরক্ষণ ও বিকাশের যোগ্যতা ও প্রেরণা লাভ করা।

১৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

১৯. ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ সাধন: ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ মানুষের মাধ্যে সুপ্ত থাকে। এগুলোই মানুষের সকল কাজের পরিচালক। আসলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও মানুষকে সাহায্য করে তার ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ। তার:

১. মন

২. মস্তিষ্ক,

৩. দৃষ্টি শক্তি,

৪. শ্রবণ শক্তি,

৫. ঘ্রাণ শক্তি,

৬. স্পর্শানুভূতি,

৭. বাক শক্তি।

এগুলোর সাহায্যে মানুষ-

১. অনুভব করে,

২. চিন্তা করে,

৩. বিবেচনা করে,
৪. অনুধাবন করে,
৫. অনুসন্ধান করে,
৬. মর্ম উপলব্ধি করে,
৭. উদ্ভাবন করে,
৮.সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,
৯. প্রকাশ করে,
১০. ধারণ বা সংরক্ষণ করে।
ইসলাম, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের এসব সুপ্ত শক্তি বিকশিত, প্রস্ফুটিত ও সংহত করে দিতে চায়।

খ. ইসলামি শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য

এখানে আমরা ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্টসমূহ উল্লেখ করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামি করণের একটি রূপরেখা পেশ করতে চাই। এ রূপরেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তবে মৌলিক নির্দেশনামূলক। ভবিষ্যতে যারা আমাদের দেশে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব লাভ করবেন, এটি তাদের খানিকটা হলেও সহায়তা করবে বলে আশা করি।
১. জ্ঞানের মূল উৎস ওহীর জ্ঞান: ওহী খোদায়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যমে। বাংলা ভাষার জ্ঞানের বাহক বই। বই শব্দটিও এসেছে ওহী থেকে। মূলত বই ওহীর রূপান্তর। এভাবে : ওহী > বহি > বই। এই ওহীই জ্ঞানের মূল উৎস। ওহী হলো, মানব জাতির ইহ ও পারলৌকিক সর্বাঙ্গীন উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে নবী রসূলদের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নির্দেশনা বা হিদায়াত। আল কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয়ের ঊর্ধ্বে। সুতরাং আল কুরআনই মানবজাতির জন্যে জ্ঞানের মূল সূত্র, মূল উৎস। আল কুরআনকেই শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অতপর গোটা শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমকে এ মানদন্ডের ভিত্তিতে সাজাতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ নির্ভুল ভিত্তির উপর। রাসূলের (সা) সুন্নাহ আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তিনিও সে ব্যাখ্যা করেছেন ওহীর ভিত্তিতে, নিজের খেয়াল খুশি মতো নয়। সুতরাং রসূলের (সা) সুন্নাহকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি ও মানদন্ডের ভিত্তিতে সাজানো শিক্ষা ব্যবস্থাই কেবল মানবতার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কারণ তা জ্ঞানের মূল সূত্র থেকে উৎসারিত হয়। আর এটাই ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার কথা।
আল কুরআনকে আল্লাহ তাআলা -হুদাল্লিন্নাস- মানুষের জীবন যাপনের সঠিক পথনির্দেশ বলে ঘোষনা করেছেন। সুতরাং মানুষকে তার জীবন যাপনের সঠিক পথ জানতে হলে কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কুরআনের জ্ঞানার্জনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আর হাদীস ও সুন্নাতে রসূল যেহেতু কুরআনেরই প্রাসংগিক জিনিস, তাই কুরআনের সাথে সুন্নাহকেও অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
২. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা: মাতৃভাষা তথা জাতীয় ভাষা শিক্ষাদানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞানের সকল উৎস এবং সব ভাষা থেকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে তা বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে জাতীয় ভাষায়। নবী রসূলরা প্রত্যেকেই জাতির জনগণের ভাষায় শিক্ষাদান করেছেন: আমি যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়েছি সে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছে স্বজাতির ভাষায়, যেনো সে সমস্ত উপদেশ আহ্বান তাদের খুলে বলতে পারে। (সূরা ইব্রাহীম: ৪)

৩. যেহেতু জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তাই আরবি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রথমিক স্তরেই আল কুরআন পড়তে শিখাতে হবে।
৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দান করতে হবে।
৫. উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হবে। তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি আইনের বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৬. দীনি ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।
৭. শিক্ষা হবে সার্বজনীন, সহজলভ্য ও উন্মুক্ত।
৮. প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।
৯. শিক্ষা হবে প্রয়োগমুখী, জীবনমুখী ও কর্মমুখী।
১০. শিক্ষকতার পেশা হবে সবচে সম্মানীয়। শিক্ষকরা হবেন সত্যের সাক্ষ্য।
১১. শিক্ষকদের নৈতিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ হবে বাধ্যতামূলক।
১২. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য সম্ভার ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি World outlook) সৃষ্টির সহায়ক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১৩. প্রাথমিক স্তর থেকেই সুন্দর আচার আচরণ তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।
১৪. পাঠ্যসূচিতে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করতে হবে।
১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হবে।
১৬. পুরুষদের মতো নারীদের শিক্ষাও হবে বাধ্যতামূলক।
১৭. অবাধ সহশিক্ষা থাকবেনা।
১৮. মসজিদসমূহকেও শিক্ষায়তনে পরিণত করা হবে।
১৯. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে চিরন্তন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গতিশীল (Dynamic)। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন অন্তর্গত (in built) ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, পরিসর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের পূর্ণবিন্যাস অনায়সেই করা সম্ভব হয়।
২০. শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ঈমান ও আদর্শিক মূল্যবোধ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিশ্বাসের চেতনাকে।
২১. শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয়টাই সমগুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।
২২. শিক্ষাদান পেশা নয়, মিশন।
২৩. অর্জিত জ্ঞান অবশ্যি চরিত্র ও কর্মে প্রয়োগ করতে হবে।
২৪. ইসলাম আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে।
২৫. শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান উভয়টাই ইবাদত।
২৬. সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিভাগের ছাত্রদের জন্যে তফসীরসহ আল কুরআন (বা আল কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ) এবং নির্বাচিত সংখ্যক হাদীস শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে।
২৭. উচ্চ শিক্ষা হবে গভেষণা ও ইজতিহাদমুখী।
২৮. সকল বিভাগের ছাত্রদেরকে ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অনুশীলন করে শিখাবার ব্যবস্থা থাকবে।
২৯. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে পাশাপাশি।
৩০. ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে থাকবে সমন্বয়,যোগসূত্র ও সুসম্পর্ক।
৩১. ছাত্রদের গড়ে উঠানো হবে স্বাধীনতা রক্ষার সৈনিক, আদর্শের প্রচারক ও সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে।
৩২. শিক্ষা প্রশাসন হবে দুর্নীতিমুক্ত, সহজ, গতিশীল ও শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক।

৩৩. শিক্ষানীতি হবে ইসলামি সংস্কৃতির উৎসস্থল। শিক্ষার সকল স্তরে ও সকল বিভাগে ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

সমাপ্ত